বাতায়ন

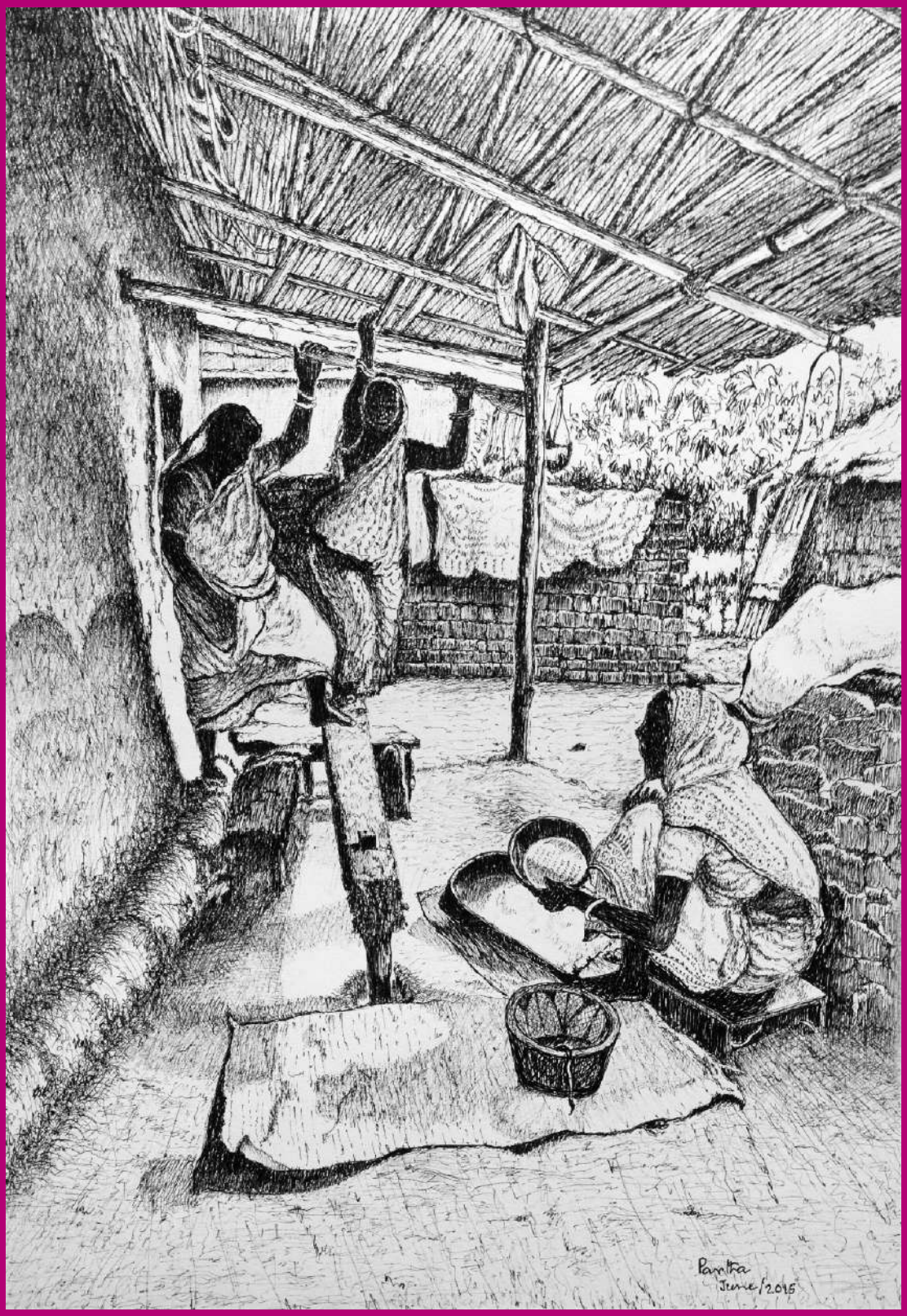

নারী

Batayan

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং,
শক্তিভূতে, সনাতনি।"

সম্পাদিকা ঃ রঞ্জিতা চ্যাটার্জী

Volume 33 | March, 2024

A literary magazine with an International reach

বাতায়ন

Issue Number 33 : March, 2024

ISBN : 9780645572681

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Parth Ghosh — **Front Cover**

"DHAAN BHANGAR GAAN"
My most humble tribute to ALL THE WOMEN in the world.
Caption – Reema Chanda, my friend and colleague Ink pen work on paper.

An artist by passion when made his living by practicing Engineering Civil Engg graduate from B.E .College , Shibpur with 52 years of professional career both in USA/ Canada and India.

Tanima Basu — **Front Inside Cover**

"Nature within me" – Paper alcohol marker and paint brush.

তনিমা পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের ।

Indira Chanda — **Back Inside Cover**

ইন্দিরা চন্দ – অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস । পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি । কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি । বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম । পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী । নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন । কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায় ।

Supratik Mukherjee — **Back Cover**

সুপ্রতীক মুখার্জী । পার্থিব বাসিন্দা । প্রজ্ঞা-পিয়াসি ।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

নানারূপে নারী

কলকাতা শহরের শীতের দুপুর। সময়টা হল সত্তরের দশকের শেষ বা আশির দশকের শুরু। তখনও বাড়ী বাড়ী ছোট ছেলেপুলেদের বই হাতে ধরে পড়ার রেওয়াজ ছিল। আমাদের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হত। তারপর কিছুদিন বড়দিনের ছুটি। জানুয়ারী মাসে আবার নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু। আমার মনে পড়ে এই বড়দিনের ছুটি আমার কাছে ছিল ভারী আনন্দের সময়। আমাদের বাড়ীতে ছাত ছিল। শীতের দুপুরে সেই ছাতে লেপ, তোষক, কাঁথা রোদ্দুরে দেওয়া হত। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরেই একটি বই হাতে করে চলে যেতাম ছাতে। হেলেন কেলারের জীবন, Treasure Island, Robinson Crusoe (বাংলায় অনুদিত ও সংক্ষেপিত), বুড়ো আংলা, ভোম্বল সর্দার – রোদের তাপে গরম হয়ে যাওয়া তোষকের ওপর বসে হারিয়ে যাওয়া তখন। বই নির্বাচনের কোন বাঁধাধরা নির্দেশ ছিল না। তাই পড়ার জগৎটি ছিল বহুল প্রসারিত ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। মিঠেকড়া রোদ্দুর, লেপকম্বলের উষ্ণতা আর গল্পের মায়াময় পৃথিবী, সব মিলিয়ে কেমন একটা নেশাগ্রস্তের মতো লাগত। কমলালেবুর মিষ্টি গন্ধে সেই আচ্ছন্নভাব সামান্য কাটলে দেখতাম পাশেই এসে বসেছেন আমার মা। কমলালেবু ছাড়িয়ে একটি একটি কোয়া আমার মুখের কাছে আনছেন। ভারী চেনা হাত। শাখাপলা আর দুইগাছি করে সোনার চুড়িতে সে হাত আমার স্মৃতিতে আজও সুষমাময় বাহুলতা। কথা হয় না। একটু পরে আমার বইতে খবরের কাগজের পাতার ছায়া। আমার বইয়ের অক্ষরগুলি সামান্য অন্ধকার হয়ে আসে। কিন্তু সেই অন্ধকারে আমি টের পাই আমার জীবনের পরম আলোকময় এক সান্নিধ্য। মা সেদিনের খবরের কাগজটি খুলে বসেছেন। আমার শিক্ষিকা মায়েরও তখন স্কুল ছুটি। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে রান্নাঘরের কাজের পাট মিটিয়ে একটু পরে ছাতে আসতেন মা। সঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্র আর একটি বই। আমার বইপ্রীতি মা এর কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

আমার জীবনের প্রথম নারী আমার মা। হয়তো আমাদের অনেকের জীবনেই তাই। মা আমার কাছে মা-ই। বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে মাকে নারী হিসেবে আলাদা করে ভাবি নি। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান সেই চিন্তা করতে শিখিয়েছে। এখন ভাবি নারী হিসেবে মা এর আশা, স্বপ্ন, সংগ্রাম এর চেহারাটি কেমন ছিল। বড় হয়ে উঠতে উঠতে আমাদের বেশীরভাগেরই চারপাশে ছিলেন মা, মাসি, দিদি, বৌদি, বন্ধু, দিদিমণি, ছাত্রী – নানা ভূমিকায় নানা প্রমীলা চরিত্র। তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ ও বেদনার যে বিশেষ কোন রং থাকতে পারে একথা তেমন করে মনে হয় নি। মানুষ তো বটেই এবং মানুষ ছাড়াও মেয়েদের শুধু মেয়ে হিসেবে একান্ত নিজস্ব যে অঙ্গন তার কথা সচেতনভাবে ভেবেছি নিজের নারীসত্তার বিকাশের পর। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অনেকসময় এমন মনে হয় যে নারীদিবস বা নারীসচেতনতার কথা বলা মানে শুধুই যেন নারীদের অবমাননা, লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের কাহিনী বলে চলা। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। মেয়েদের অবদমন ও তা থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই তো আছেই। তবে তারই পাশাপাশি আছে নারীত্বের উদযাপন। মেয়েরা তো শুধু 'বিপ্লবের সেবাদাসী' নয়। নারীচর্চার অনেকগুলি দিকের মধ্যে একটি দিক হল নারীত্বের উদযাপন। ৮ই মার্চ ছিল বিশ্ব নারীদিবস। সেই উপলক্ষ্যে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের ও সমাজসংসারে তাঁদের ভূমিকা বদলের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়েছে আলোচনা ও লেখালেখির মাধ্যমে। আর সেসব থেকে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল দেশে বিদেশে রমণীদের স্বাধিকার অর্জনের প্রয়াসের কাহিনী বহুবর্ণময়। আজকের দিনেও জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক আমেরিকার মহিলাদের ভোটাধিকার পাওয়ার লড়াইয়ের ইতিহাস। মহিলা বিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার নেপথ্যের ঘটনা অনুপ্রেরণার উৎস সবযুগে। সেই কারণেই আলাদা ভাবে নারীদিবস পালন তাৎপর্য্যময়।

বাতায়নের এই সংখ্যাটির কেন্দ্রে অবশ্যই নারী। কাছ থেকে দেখা রক্তমাংসের নারী, মহাকাব্য ও সাহিত্যের মহিলা চরিত্র, বীরাঙ্গনা, সাধিকা, শক্তিশালী রানী – নানারূপে নারী আমাদের এই সংখ্যার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণে

উঠে এসেছে। মার্চ মাস পার হয়ে গেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি হয়ে গেল প্রায়। বাংলা ক্যালেন্ডারে বর্ষ বদলের সময় এসে গেল। তা হোক। সত্যি বলতে কি নারীদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান জানানোর কোন বিশেষ মাস বা দিন নেই। নারী, পুরুষ ও অন্যান্য সব মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় গড়ে ওঠে সুস্থ ও সুন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। সমাজের কোন বিশেষ অংশের মানুষ যদি অপুষ্টি, নৈরাশ্য ও মানহীনতায় কষ্ট পান তাহলে সে সমাজের পক্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো অসম্ভব। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই শুভবোধ সবসময় বা সবজায়গায় জাগ্রত হয় না। আমাদের চারপাশে প্রশ্নচিহ্ন অনেক। উত্তর তাই খুঁজে চলতেই হবে। বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে নিজেদের মতো করে আমরা নিবেদন করলাম নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজের বৃহত্তর পরিসরে আলোর দিশারী কিছু মানুষের কথা। তাঁদের সামগ্রিক মানব সত্ত্বার একটা জায়গা জুড়ে আছে নারী সত্ত্বা। তাঁদের সাহস, সততা, জ্ঞান ও ধৈর্য্যকে আমাদের কুর্নিশ।

আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে বিশেষ বিষয়ভিত্তিক বাতায়নের এই সংখ্যাটি।

বাতায়ন পত্রিকার গোষ্ঠী পক্ষ থেকে সকল'কে জানাই বাংলা শুভ নববর্ষ '১৪৩১' এর অসংখ্য শুভেচ্ছা ও ভালবাসা । সকলে ভাল ও সুস্থ থাকবেন ।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী

এই নারী সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন –

সুপ্রতীক মুখার্জী | পলাশ্রী রায় | সৌমিত্র চক্রবর্তী | বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী |

নুপুর রায়চৌধুরী | শম্পা দে | রুদ্রশংকর | তপনজ্যোতি মিত্র |

মহুয়া সেনগুপ্ত | অঞ্জলি ভট্টাচার্য | দেবীপ্রিয়া রায় | মানস ঘোষ |

শহিদুল ইসলাম | জয়ন্তী করঞ্জয় | Jay Banerjee |

Suparna Chatterjee | অনিতা মুখোপাধ্যায় | মনীষা বসু |

শাশ্বতী বসু | ময়ূরী মিত্র | ইন্দিরা চন্দ | সৌমিক বসু |

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় | তাপস কুমার রায় | মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায় |

সুজয় দত্ত | খনা দেব | তনিমা বসু | পারিজাত ব্যানার্জী | উদয় মুখার্জী

সর্বদা .... সর্বত্র .... অস্তিত্বে .... আদর্শে .... মমতায় .... প্রতিবাদে ....

পাশে পাশে
পায়ে পায়ে
হাতে হাতে ধরি ....
সেই মোর স্থান
প্রাণে প্রাণে
প্রাণপণে
প্রাণদান করি
প্রাণশক্তি গড়ি
সে-ও মোর স্থান

সুপ্রতীক মুখার্জী

পলাশ্রী রায়

নির্বাসন

আমার ঘরে ফেরা আর হবে না মা,
সেই ছাদ, সেই বারান্দা, সেই রোববারের গরম গন্ধ!
মেঘের গায়ে চেপে সেই রূপকথাদের ভিড়,
তোমার গায়ের গন্ধ আর তোমার লাল টিপ।

মনে আছে মা ছোটবেলার সেই দিনগুলো ?
কেমন খোলা জানালার মতন ছিল,
লোকের অরণ্যে ভরা।
সেই পাশের বাড়ির আন্টি, তার হাট করা দরজা,
আমি কিনা সাইকেল চালাবো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।

এখানে জানো তো মা সবার দরজা বন্ধ,
লোকেরও বিশেষ যাওয়া আসা নেই,
নেই সেই খোলা জানালার দিনগুলো ।

ঘরে ফেরা আমার আর হয়তো হবে না মা,
সেই শীতের রোদ মাখা ছুটির দিনগুলো,
মনে আছে তোমার ?
তখন শীতের ছুটি মানেই মামা বাড়ি,
মামা বাড়ির সেই বিশাল উঠোন জুড়ে খেলনাবাটি –
বাগানে কতই না রকমারি ফুল ছিল বলো!
লাল, সাদা, নীল, হলুদ –
ঠিক শৈশবের স্বপ্ন গুলোর মতন রঙিন ছিল দাদুর বাগান।

কৃষ্ণচূড়া গাছটা মনে আছে তোমার ?
আমার খুব প্রিয় ছিল জানো!
কি বিশাল, আগুনের মতো রঙ সত্ত্বেও তার কত ছায়া,
নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম যে,
এক দু'বার বেশ জড়িয়ে ধরে কথাও বলেছিলাম আমি।
কেন কেটে ফেললো গাছটাকে মা ?
ওর সেই আগুন রঙ হানল নাকি ওর শীতল মায়া, জানল না কেউ ?

শৈশবের উষ্ণতা মাখানো ঘরগুলোতে আজ
কোনো ফুল ফোটেনা মা –

রয়ে গেল এক পোড়ো বাড়ি,
হারানো একমুঠো স্বপ্ন নিয়ে।
ওখানে যে এখন প্রতিটা ঘরের নিঃশ্বাস বড় ভারী
আগলে রাখা সেই স্মৃতিগুলোও দিয়েছে বিদেশ পাড়ি।
না গো মা ঘরে ফেরা সত্যিই হবে না আর আমার ।

তুমি চিন্তা করোনা,
দিব্যি আছি এই শহুরে ভিড় আর আলোর মাঝে।
কিছুটা শূন্যতা আর কিছুটা উষ্ণতা মেখে।
আমার এক ফুটফুটে সংসার এখানে,
হেসে খেলে স্মৃতিগুলো বুনছে আবার,
আবার ফুটবে সেই লাল নীল হলুদের বাগান,
নতুন ঘর পেতেছি খুব মিষ্টি একখান -
তাই তো মা ঘরে ফেরাটা যে আর হবে না আমার।

তোমার কাছে আসবো কখনও সখনও,
তুমিও আসবে এই নতুনের দ্বারে।
আসা যাওয়া আমাদের থাকবে
ঠিক সেই শৈশবের স্মৃতিগুলোর মতন,
হঠাৎ আসা, হঠাৎ যাওয়া,
কিন্তু ফেরার পথ যে হারিয়ে গেছে মা,
ফেলে রেখে সব পাওয়া না পাওয়া।।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

নারী দিবস

রত্না, তুই নারী দিবস চিনিস ?
শুনতে পাস নারীর দিনের ডাক ?
তোর শোনবার দরকার নেই কোনো
রত্না, বাবুর বাসন মাজতে থাক।

আসলে তোর রোজই নারী দিবস
নারীর দিন এবং নারীর রাত
ঘামের গন্ধে নিমেষে মিশে যায়
মৌরলা টক আর দু'মুঠো ভাত।

রত্না, তুই ভোর পাঁচটায় ছুটিস
একটাই মেয়ে, সে মেয়ের ইস্কুলে
নিজের পায়ে দাঁড়ায় যদি ও
পায়ের হাজা যাবি সেদিন ভুলে।

ও রত্না, যে কাজ করিস তুই
সেই কাজে সি.এল., পি.এল. আছে ?
জ্বর গায়েও তাই ছুটিস রোজ
বাঁধা কাজ ছাড়িয়ে দেয় পাছে !

আছে তোর গ্র্যাচুইটি আর পি.এফ. ?
স্বাস্থ্যবিমার আওতায় তুই পড়িস ?
জীবন বিমা কি তা-ই জানিস না ?
হুট করে ধর যদি তুই মরিস !

নাকি তোরা মরতে জানিস না ?
লড়াই আর লড়াই খালি জানিস।
ও রত্না, এতো দুঃখ সয়েও
কোন যাদুতে মুখে হাসি আনিস ?

রত্না, তুই ছোট কেবল ছোট
পেরিয়ে যা জীবনের সব বাঁক
তোর সাইকেল ওড়াক জয়ের ধুলো
নারী দিবস পেছনে পড়ে থাক।

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

শুভ জন্মদিন মা

এখন মধ্যরাত
আহা শব্দ কোরো না ঝুমুর

জলের তলায় মৎস্য কন্যেদের গায়ে ফসফরাস জ্বলছে
তাদের ঘুম ভাঙবে এখন

সবুজ ইলের গায়ে লাল আভা
ইঁটপাতা গলি বেয়ে চলে জলের তলায়

সেখানে স্ট্রিটলাইটের গা বেয়ে
উড়ন্ত কাঠবেড়ালি

তার তলপেটের গোলাপি আলো
চুঁইয়ে পড়ছে রাস্তাজুড়ে

এইদিনে আমাদের দেখা হয়
প্রতিবার
চ্যাটচ্যাটে লম্ফের আলোটাও
নিভে যাবে এবার

মাঝরাতে আলতা পায়ে
লাল পেড়ে শাড়িতে
মা উঠে আসবেন
শ্যাওলা ধরা সিঁড়ি বেয়ে এই ঘরে

জলের বুকে তুমি
ঢিল ছুঁড়ো না ঝুমুর
শব্দ কোরো না আর
প্রবালের কাছে।

নুপুর রায়চৌধুরী

নির্জন সন্ধ্যা

এই নির্জন সন্ধ্যাগুলো,
আমার খুব একা লাগে ।
চেয়ে চেয়ে দেখি,
মহীরুহের সীমান্ত লেপ্টে,
সূর্যের শেষ রক্তবিন্দুর মায়া ।
ভবঘুরেগুলো দূরপাড়ি দেয়,
রাতের আস্তানার খোঁজে,
জঙ্গলে ক্লান্তির ঘুম নামে,
অর্থহীন শব্দেরা আমায় ঘিরে,
কেমন ফিসফিস করে ।
আমি খুঁজি ওদের উৎস,
অলিন্দে না করোটিতে?
বুঝতে পারি না, ধাঁধা লাগে,
টেনে নিয়ে চলে যেতে চায়,
পাকদন্ডীর ফেলে আসা,
কদাকার পিচ্ছিল পথে ।
আমি তীব্র প্রতিবাদ করি,
যুক্তির বেড়াজাল বাঁধি,
মাটি আঁকড়ে রক্ষাগন্ডি কাটি ।
হিসহিস করে ওদের উদ্যত ফণা,
প্রচন্ড নিষ্ফলতায়,
বারংবার, বারংবার ।
শ্রান্ত আমি ঘুমাব এখন,
চোখে এঁকে ভোরের স্বপন ।

শম্পা দে

ব্রাত্য

প্রতীক্ষার হলো অবসান মা আসিল ঘরে,
আলোর রোশনাই দিকে দিকে আনন্দে মন ভরে।
বিষণ্ন মনে মেয়েটি ছিল ঘরের এক কোণে
স্বামীহারা হয়েছে সে আনন্দ নেই মনে ।
ছুটে এসে ছেলেটি যে শুধোয় তার মাকে,
"যাবেনা মা দেখতে ঠাকুর আজ সবারই সাথে ?"
আঁকড়ে ধরে ছেলেটিকে মা বললো উঠে কেঁদে ,
"ঠাকুর দেখতে মানা আমার মন ও চায়না যেতে।"
ছেলেটি তা শুনতে নারাজ ঠাকুর দেখতে চায়
মাকে নিয়ে দৌড়ে সে যে প্যান্ডেলেতে যায়।
দুর্গা মা কে দেখে মেয়ের চোখ যে জলে ভরে
আঁকড়ে ধরে ছেলেটিকে মুখে বাক্যি নাহি সরে।
পাড়াপড়শি মেয়েটিকে যে দেখে ঠারে ঠারে
ভাবতে থাকে লজ্জাহীনা আজ এসেছে কি করে।
স্বামীর শোক এরই মধ্যে যায় কি করে ভুলে
ছেলে নিয়ে মায়ের কাছে সটান এল চলে!
মাকে দেখে মেয়েটি ক্ষণেক দুঃখ ভুলে যায়
"আবার আমি আসবো মাগো", বলে বিদায় নেয়।
দশমীতে পূজার থালি সাজিয়ে নিয়ে সে
ছেলে নিয়ে মায়ের কাছে চলেই আসে মেয়ে।
মনের ইচ্ছা আজকে সে যে করবে মাকে বরণ
এগিয়ে গিয়ে পরশ করে মায়ের রাঙা চরণ।
"একি অনাসৃষ্টি"! বলে সবাই করে প্রতিবাদ
এতই বড় স্পর্ধা মায়ের চরণ ধরার সাধ!
কলিকালে নিয়ম রীতি সব গেছে রসাতলে
বিধবা হয়ে মাকে বরণ !এই সমাজে চলে ?
বরণথালি ছিটকে পড়ে চোখ ভেসে যায় জলে
ধীরে ধীরে মেয়েটি তার বাড়ির পথে চলে ।
মা তুমি যে সর্বজনীন এতো সবার জানা
তবে কেন ব্রাত্য মাগো বরণে স্বামীহীনা ?
প্রকৃতির নিয়মে কেউ যায় আগে কেউ পরে
তবু কেন আজও সবাই মেয়েটির দোষ ধরে ?
এসো আমরা সবাই মিলে শপথ করি আজ
নতুন সমাজ গড়াই হবে আজ আমাদের কাজ ।

রুদ্রশংকর

নারী দিবসের লেখা

তুমি আমার উপত্যকার সৌন্দর্য নিয়ে লিখতে পার
মেঘলা দিনে মেখে ফেলতে পার প্রেম
পরক্ষণেই চোখ দিয়ে কেটে ফেলতে পার আমাকে
ছুঁড়ে ফেলতে পার অনভ্যস্ত খিদের সামনে
আসলে এমন এক অতীত থেকে উঠে এসেছি
যেখানে তোমার চাওয়া গুলো কখনো শেষ হয় না

যে মুখে দৈনিক আলো পড়ার কথা ছিল
সেই মুখে সংশোধন না-হওয়া ধর্মের রঙ মেখে
তুমি বলতে পার মেয়েদের হাত নেই, পা নেই
যেন এক মূল্যহীন মানুষ
যেন এক নিরীহ শস্যক্ষেত্র

ইচ্ছে করলে
তুমি আমাকে মধ্যযুগের ময়লায় ফেলে আসতে পার
উপহার দিতে পার সামাজিক আতঙ্ক
তবু আমার মনের মধ্যে
হাজার মেয়ের মুক্তি দেখতে পাই
অল্প অল্প করে সভ্য শতাব্দীর কাছে ফিরি
প্রিয় পুরুষ দ্যাখো,
প্রিয় সভ্যতা দ্যাখো,
একটু একটু করে
মানুষের সমান অধিকার হেঁটে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।

তপনজ্যোতি মিত্র

জীবন করেছে জয়

আজও চিঠি লেখো তাকে ? নিভে যাওয়া জ্যোৎস্নাকে ?
তোমাকে ডেকেছে যদি সেই,
উদাস পড়শী বাড়িঘরে, মন যদি কেমন করে,
শুধু সোহাগবতী সেখানে নেই ।

ঢেকে যায় বিষণ্ন মাঠ, শেখা বাকি জীবনের পাঠ
আলো-ছায়া বিভাস-পূরবী এই,
বেজে যায় ধুন-দরবারী, কান্না ভেজা ধূমাবতী বাড়ি
হাত নাড়ে কাজলকন্যা সেই ।

কে কোথায় দগ্ধ হল, আবার জ্যোৎস্না মথিত হল
কায়া আর ছায়া মিলে গেছে যেই,
উথালি-পাথালি ঝড়ে, নির্জন বাতিঘরে
সমুদ্র সংকেত জানে শুধু সেই ।

তখন বেহুলা সতী, চলেছে অমরাবতী
স্বর্গ মজেছে তার নৃত্যশৈলীতেই,
দেখেনি হাহাকারে, ভেঙে যাওয়া অলংকারে
জীবন করেছে জয় মৃত্যুকেই ।

মহুয়া সেনগুপ্ত

পূর্বাবস্থা

প্রেতিনীর মত আসশ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকি ন্যালাখ্যাপা, বন্ধুহীন

নদীঘাট, দেবালয়,
সিঁড়ি নেমে গেছে গভীরে
বাইরের আঁধার ঘিরে ধরে ভেতরমহল
লণ্ঠন নিভে গেছে, ধুলো ধুলো ছায়া –

কে আবার
সানন্দে অমৃতলোক খুঁজে এনে দেবে!

বাহিরপথে

অন্ধ কারাগারের অনুভব
গরাদের ছায়া দেখে
অশরীরী লিখন দেয়ালে।

সংকেত আসে –
নৈশ প্রহরীর ঘুমে,
ছিন্ন শিকলে
অসম্ভব অবকাশ আনে।

এইভাবে মহানিষ্ক্রমণ, এইভাবে
জলের নৈকট্য বুঝে নাও।

অলক ভট্টাচার্য

প্রতিদিন মাতৃদিবস

দূর্গম বিচ্ছিন্ন পথে ছিন্ন-ভিন্ন তোমার পদতল,
কখনো অসীম বেদনার প্রাবল্যে আঁখি করে ছলছল ।

অনন্ত কাননে সুন্দরের কলস কাঁখে তুমি সুন্দরী,
কখনো প্রেমের আবেশে রূপসী তুমি ওগো নারী ।

নিশ্ছিদ্র নিবিড় স্নেহে করুণাময়ী তুমি মাতা,
তুমি সঙ্গী, তুমি সঞ্চয়, তুমি সঞ্চয়িতা ।

নূতনের হৃদয়-স্পন্দনে তোমার উপস্থিতি হয় অনুভব,
পৃথিবীর গৌরব তুমি, বসুন্ধরার সৌরভ ।

অঞ্জলি ভট্টাচার্য

ছুটি

আজকের দিনটা কিচ্ছু না করার দিন
পা ছড়িয়ে কার্পেটে বসে থাকার দিন
শুধুই আলসেমি করার দিন।

আজকের দিনটা কবিতা পড়ার দিন
রবি ঠাকুর ও জীবনানন্দের দিন
শুধুই থেমে থাকার দিন।

আজকের দিনটা মায়ের শাল জড়ানোর দিন
এলো মেলো হাওয়ার সাথে ভেসে যাওয়ার দিন
শুধুই মনে পড়ার দিন।

আজকের দিনটা বেহাগ, ইমন আর ভৈরবীর দিন
তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার দিন
শুধুই কথা না বলার দিন।

আজকের দিনটা মায়ের শাল জড়ানোর দিন।

দেবীপ্রিয়া রায়

মায়ের নাম আনন্দময়ী

মা – এই শব্দটি সকল আশা, সকল ভরসার দ্যোতক। জন্ম মুহূর্ত থেকে মানব শিশু জানে মায়ের কোলটিতেই তার নির্ভয় আশ্রয়। মানবী মায়ের কোল মানুষের জন্মমৃত্যুর মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ক্ষুদ্র এই সীমার বাইরে অনাদি কাল অনন্ত গগনেও সেই অসীম যিনি শাশ্বত, চিরন্তন সত্ত্বা তিনি মাতৃরূপে তাঁর কৃপার কোলটি জীবের জন্য পেতে রেখেছেন। ঈশোপনিষদ যে শাশ্বতকে বর্ণনা করেছেন এই বলে,

ঈশাবাস্যঃ ইদম সর্বম ইয়ৎ কিঞ্চ জগত্যাম জগৎ

সর্ব ব্যাপী সেই শাশ্বত সত্ত্বার মাতৃস্নেহ ঘিরে রয়েছে আমাদের সর্বদা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হলে বলা যায়, "তুমি যে চেয়ে আছো আকাশ ভরে, সারাদিন অনিমেষে দেখছো মোরে", কিন্তু আমরা নিজেদের সীমিত গন্ডীটুকু নিয়ে ব্যস্ত থেকে তাঁর সেই অতন্দ্র অসীম স্নেহচ্ছায়াকে চিনে নিতে পারিনা। পৃথিবীর সকল ধর্মের ধারায়, সকল ধর্মশাস্ত্রে এই এই অপার ঈশ্বর স্নেহের কথা নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদী ক্রীশ্চান মুসলিম ধারায় এই সতত রক্ষাকর্ত্রী কৃপা শক্তিকে বলা হয়েছে শেকিনা বা সাকিনা। সেখানে বলা হয় যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর সন্তানদের এ জগতে পাঠিয়েও নিজের দুটি বাহু প্রসারিত করে মাতৃস্নেহে তাদের আগলে রয়েছেন। কিন্তু চিন্ময়ী সেই স্নেহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না। হঠাৎ কখনো কি এক অপূর্ব খেয়ালে সেই চিন্ময়ী স্নেহ ঘনীভূত হয়ে আমাদের মাঝে মানবী মায়ের দেহ ধরে দেখা দেয়। আমাদের মানব জীবনের সীমিত গন্ডীর মাঝে সেই মা এনে দেন অসীমের স্বাদ আবার তারই সাথে সাথে মুছিয়ে দেন দুঃখ কষ্ট, ছিন্ন করে দেন সংশয় জাল। কখন কোথায় কিভাবে তিনি আসেন, তা কেউ বলতে পারে না; বাইরের দৃষ্টিতে সকলের চোখে তিনি অন্যের মতই মানুষ; মানুষের মতই তাঁর জীবন কাটে, অথচ যখন তিনি এসে কারুকে পরম মমতায় তাঁর আশ্রয়ে টেনে নেন, তখন লৌকিকের মাঝে সেই অলৌকিক স্নেহের স্পর্শে তাঁর সন্তানের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এমনি এক মাতৃ রূপে দেখা দিয়েছিলেন আনন্দময়ী মা। দেশ বিদেশ হতে কাছের দূরের সাগর পার হয়েও সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর কাছে এসেছে, কেউ বা প্রথমেই তাঁকে চিনেছে, কেউ এসেছে কৌতূহলে, কেউ তাঁর ডাক পেয়েছে অন্তরে বা কোন অলৌকিক ঘটনায় আবার এই লেখিকার মত কোন কোন জন পারিবারিক আবহে আশৈশব তাঁকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে। তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছে সাধারণ গৃহস্থ, সাধক, সাধিকা, শিক্ষিত অশিক্ষিত দরিদ্র ধনকুবের, রাজা আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী জ্ঞানী। উচ্চ মার্গের সাধক তাঁর কাছে এসে সাধন মার্গের সমস্যা বা বাধার সমাধান খুঁজে নিতেন। কিন্তু সাধক হন বা সংসারী, বিশ্বাসী হন বা বা সংশয়ী সকলেরই তিনি ছিলেন মা, সবার সাথে তাঁর সহজ সম্পর্ক। তাঁর দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। কোন কঠিন দুরূহ বাগাড়ম্বর নয়, মায়ের সাথে সন্তানেরা কথা বলেছে সহজ সাধারণ ভাষায়, সেই কথা বার্তার মাঝে তারা পেয়েছে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের উপদেশ, তাঁর মুখের সর্বদা লেগে থাকা মিষ্টি হাসিটির মাঝেই ছিল অপার মাতৃস্নেহ আর স্বস্তির আশ্বাস। তাঁকে সাধক ও গৃহী নানা লোকে নানা সময়ে প্রশ্ন করেছে, "তুমি কে ? কি তোমার স্বরূপ ?" প্রতিবার সেই মিষ্টি হাসির সাথে উত্তর পেয়েছে, "আমি তোমাদের ছোট্ট মেয়ে" এই ছিলেন ঈশ্বরের মাতৃ রূপের মূর্ত প্রতীক আনন্দময়ী মা। লৌকিক লীলায় তাঁর ব্যক্তি জীবন কেটেছে আমাদের মত স্থান কালের মাঝে। আমরা সকলে তাঁকে দেখেছি লীলা চঞ্চল, স্নিগ্ধ হাস্যসমুজ্জ্বল মায়ের রূপে, কিন্তু সেই সাথেই তিনি থেকেছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর জীবনের খন্ড খন্ড ঘটনা মিলিয়ে বিচারবুদ্ধিতে তাঁকে বুঝতে গিয়ে বিচারের খেই হারিয়ে যায়; সকল খন্ড মিলে মিশে জেগে থাকে এক অখন্ড সত্ত্বার আভাস। অক্ষর আর লেখার পরিসরে তাই আনন্দময়ী মা'কে নিয়ে সঠিক আলোচনা দুরূহ বা বলা ভাল তাই প্রায় অসম্ভব। তিনি কি অপালা, শাশ্বতী, বিশ্ববারার মতন বেদ বর্ণিত ব্রহ্মবাদিনী ঋষিদের মত একজন? ব্রহ্মবাদিনী তিনি অবশ্যই, কিন্তু তারও উর্দ্ধে তাঁর পরিচয়

যে তিনি মাতৃস্বরূপা। বেদের ঋষিরা চিরন্তন সত্যকে মন্ত্রের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু সে মন্ত্রের মাঝে তাঁদের মাতৃরূপের বর্ণনা কোথাও পাই না। আনন্দময়ী মন্ত্র রচনা করেননি, কিন্তু দুরূহতম জ্ঞানকেও তিনি সন্তানকে মায়ের মতই সহজ ভাষায় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তবু তাঁকে জানার চেনার চেষ্টা করতে গেলে তাঁর লৌকিক লীলার ও তাঁর উপদেশের বর্ণনা ব্যতীত উপায় নেই।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ (ইংরাজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল) ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে সাধারণ মধ্যবিত্ত এক ধর্মপ্রাণ পরিবারে তিনি জন্ম নেন। পিতার নাম ছিল শ্রী বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য, মোক্ষদা সুন্দরী ছিল তাঁর মায়ের নাম। পিতার প্রিয় ছিল হরি সঙ্কীর্তন। শোনা যায় ভক্তিমতী মোক্ষদা কন্যা জন্মের আগে স্বপ্নে নানা দেবদেবীর দর্শন পেতেন-অলৌকিকের আগমনের সূচনা হয়তো তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ভূমিষ্ট হওয়ার পরে নবজাতিকাটি অন্যান্য শিশুর মত কেঁদে ওঠেনি, বরং তাঁর মুখে লেগেছিল হাসির আভা। পরবর্তী কালে এ প্রসঙ্গে কথা হলে পর তিনি সকৌতুকে বলতেন, "কাঁদব কেন ? আমি তো দেখছিলাম যে ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়া আমগাছটির উপরে চাঁদ কেমন শোভা করেছে।" সত্যিই তো, মানব দেহে জন্ম নেওয়াটা তো পরম সত্ত্বার লীলা খেলা মাত্র, খেলার মাঝে কেঁদে ওঠার প্রশ্ন কোথায় ? মায়ের পরমভক্ত পন্ডিত ও সাধকশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলতেন, মা জন্মমুহূর্ত হতেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের সত্ত্বা ও জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন। সকল জীবই অবশ্য পূর্ণ ব্রহ্মের সাথে এক। পূর্ণ হতেই তারা আসে, কিন্তু সাধারণ জীব পূর্ণের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সীমিত জগতের খন্ড খন্ড ক্ষুদ্রের মোহে আবিষ্ট হয়ে তাদের দিকেই ছুটে চলে। সেই সব সীমিত খন্ডকে সে নিত্য পায়, নিত্য হারায়, নিত্য খুঁজে পায় আবার হারায়। তার জীবন ওই হারানো আর পাওয়ার মোহে আবদ্ধ হয়ে হেসে, কেঁদে কেটে যায়। কিছু কিছু জীব এই মোহাবিষ্ট জীবন হতে সাধনার মাধ্যমে মুক্তি পান – তাঁদের বলা হয় জীবন্মুক্ত সাধক। কিন্তু পূর্ণব্রহ্ম মা আনন্দময়ীর চেতনা কখনো অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়নি। তিনি গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভাষায় "নিত্যমুক্ত"। তাঁর জীবনকে বুঝতে হয় আমাদের হাসি কান্নার উর্দ্ধে অখণ্ডের পটভূমিকায়। যিনি সদাই পূর্ণ, তিনি কী-ই বা চাইবেন, কী-ই বা পাবেন! তাঁর সদাজাগ্রত চৈতন্য তাই জন্মমুহূর্ত হতেই প্রতিটি ঘটনা লক্ষ্য করেছে সকৌতুকে, কিছুই বিস্মৃত হয়নি। আপনাতে আপনি পূর্ণ মায়ের কোন কিছুরই অভাব ছিল না, তাই কোন প্রয়োজন তাঁর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। শিশু যেমন আনন্দে নিজের খেয়াল খুশীতে খেলে যায়, তেমনি খেয়ালে তিনি জীবনের খেলা খেলেছেন।

পরমাসুন্দরী শিশুটির মাতা পিতা নাম রেখেছিলেন নির্মলাসুন্দরী। প্রথম দিকে নির্মলাসুন্দরীর জীবন বিশেষ করে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে সেকালের পল্লীবাসিনী আর পাঁচটি মেয়ের মত। তিনি কখনই গেরুয়া ধারিণী সন্ন্যাসিনী ছিলেন না। ঘরের কোণে পিতামাতার আদরে অন্যান্য শিশুদের মতই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। অন্য বালক বালিকাদের সাথে বনে জঙ্গলে খেলা করে পুকুরে সাঁতার কেটে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। তাই অন্যান্যদের সাথে তাঁর পার্থক্য শিশুকালে কারুর বড় নজরে পড়ত না। নামের মতই বড় সুন্দর আর নির্মল ছিল তাঁর স্বভাব, যা সকলকে মুগ্ধ করত। হিংসা দ্বেষ বা ঝগড়া তিনি করতেন না। তবে লক্ষ্য করলেই দেখা যেত যে আচার আচরণে একটি দিব্য ভাব বালিকাটিকে ঘিরে রয়েছে। শোনা যায় যে কীর্তন শুনলে বালিকাটির তখন থেকেই ভাব সমাধির মত হত, যদিও নিতান্ত শিশু বলে সেটা তখন বিশেষ কেউ বুঝতে পারত না। বরঞ্চ তাকে দেখে অনেকেই ভাবত যে শিশুটি যেন একটু অপরিণত বুদ্ধি কারণ সকল সময়েই সে কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাসীন, নির্লিপ্ত। তার আপন পর বোধ নেই, আঁচলটি পর্যন্ত গুছিয়ে পরতে পারেনা। খাওয়ার সময়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে যেহেতু নির্মলার স্বভাবটি ছিল বড় সরল আর মিষ্ট, তাই ঘরে পরে সকলেই তাকে ভালবাসত। একটু বড় হলে তখনকার রীতি অনুসারে মোক্ষদাসুন্দরী কন্যাকে সংসারের কাজকর্ম শেখাতে থাকেন ও মায়ের পিছু পিছু ঘুরে ঘুরে তাঁকে সাহায্য করতে করতে মেয়ে ঘরের কাজে ক্রমশঃ নিপুণ হয়ে ওঠে। এইসময় মা, বাবা তাকে গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি করে দেন ও তখন বোঝা যায় যে বালিকা নির্মলা পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী; ইস্কুলে যেটুকু পড়ানো হয়, তার বাইরেও পাঠ্যপুস্তকের সমস্তটুকুই সে অনায়াসে শিখে ফেলে। দুই বছর পড়ার পর অবশ্য তার পড়াশুনায় ইতি টানতে হয়, কারণ তার তখন বারো বছর বয়েস – সেকালের

রীতিতে তার তখন বিবাহের সময় হয়ে গিয়েছে। এর পর নির্মলা আর কখনো ইস্কুল কলেজে যাননি, অথচ পরবর্তী কালে যখন সকলে তাঁকে আনন্দময়ী মা বলে জেনেছে, তখন দেখেছি যে তিনি সাধক ও জ্ঞানী গুণী পন্ডিতদের সাথে অবাধে দুরূহ শাস্ত্র আলোচনা করেছেন, কখনো বা নিভৃতে (মায়ের অনুগামীরা তাঁকে private বলতেন) সেইসব সাধক বা অন্যান্য ভক্তদের সাধনার পথনির্দেশ করেছেন। দেখতাম যে সুদূর বিদেশ হতে অনুসন্ধিৎসু ভক্তরা তাঁর কাছে এসে নিজেদের ভাষায় তাঁকে নিজেদের কথা জানিয়েছে। মা তাদের কথা শুনে বাংলা বা ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন। কারুর সাথেই কখনো ভাব বিনিময়ের বাধা সৃষ্টি হতে দেখিনি।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে নির্মলার বিয়ে হয় ঢাকার রমণীমোহন চক্রবর্তীর সাথে। পরবর্তী জীবনে রমণীমোহন মায়ের কাছেই সন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণ করে ভোলানাথ নামে পরিচিত হন। মা ভোলানাথ নামেই তাঁর উল্লেখ করতেন। বারো বছরের কিশোরী নির্মলা লালপাড় শাড়ীতে আবক্ষ ঘোমটা টেনে শ্বশুর ঘর করতে ঢাকায় এলেন। বছর দুই পর শ্বশুর মশায় পরলোকগত হলে পর তিনি আসেন ঢাকা জগন্নাথপুরের রেলওয়ে কোয়ার্টারে ভাসুর রেবতীমোহনের সংসারে। রমণীমোহন তখন কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। পরের চারটি বছর নীরবে নিরলস ভাবে ঘরের কাজ করে নির্মলার সময় কাটে। শুনেছি যে রান্নাবান্না, সেলাই ফোঁড়াই সবেতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। যখন আনন্দময়ী মায়ের রূপে তাঁর কাছে অনবরত ভক্ত সমাগম হত, তখনও তাঁকে আশ্রমিকাদের বা কোনো ভক্ত মহিলাকে গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতে দেখতাম। অবশ্য সে সব হত তাঁর হঠাৎ খেয়ালে। আগেই যেমন বলেছি যে কোন পূর্বনির্ধারিত নিয়মে তাঁকে বোঝা যেত না। মানবী জীবনের ছন্দের মাঝে এই অসীমের কৃপার বর্ষণ আনন্দময়ীকে ঘিরে সতত চলত।

ভাল করে বুঝতে ফিরে যাই তাঁর জীবনকথায়। ভাশুরগৃহে থাকার সময় হতেই তাঁর মধ্যে এই অলৌকিকের লীলা ক্রমশ দেখা দিতে থাকে। শোনা যায় যে শান্ত নম্র বধূটির মাঝে নানা যৌগিক আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের ক্রিয়া আপনি ফুটে উঠত, রান্না করতে করতে তিনি হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে উনুনের পাশে লুটিয়ে থাকেন। সেকালের গ্রামসমাজে যা সচরাচর ঘটত, এক্ষেত্রেও তাই হয়। শ্বশুরালয়ের আত্মীয়রা ভাবেন যে তিনি ভূতগ্রস্ত ও সেইমত ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে মহাভাব তখন নির্মলাসুন্দরীর মাঝে ফুটে উঠেছে, তা ওঝা কি করেই বা দূর করে! অথচ নির্মলাসুন্দরী কখনো কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা পাননি। স্বামী দূরে থাকতেন; ঘরে ফিরলে পর আত্মীয়দের কাছে কিশোরী বধূটির সম্বন্ধে নালিশ শুনতেন। তারপর নিভৃত শয়নকক্ষে যখন তাঁকে সামান্য স্ত্রীর মতন কাছে পেতে চেষ্টা করতেন, সমাধিস্থ স্ত্রীর মাঝে সেই মহাভাব, সেই সব যৌগিক ক্রিয়ার প্রকাশ দেখে স্তব্ধ হয়ে দূরে সরে থাকতেন। এইখানে এই কথাটি মনে থাকা ভাল যে সেই সময় কিংবা তার পরেও নির্মলা কোনদিন মুহূর্তের জন্যও ভোলানাথের প্রতি নিজের স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করেননি। স্বামী তাঁর কাছে সর্বদা স্বামী হিসাবেই মান্য থেকেছেন।

নির্মলার যখন ১৭ কি ১৮ বছর বয়েস, তখন স্বামী অষ্টগ্রামে তাঁকে পৃথক সংসারে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তারও পরে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে তাঁরা এলেন বাজিতপুরে। মধুর স্বভাব ও হাস্যময়ী হলেও নির্মলা তখন হতেই কিছুটা নিভৃতচারিণী তাই তাঁর অধ্যাত্মজীবন তখনো বাহিরের জগতে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু বাজিতপুরে আসার পর হতে তাঁর দেহে থেকে থেকেই নানান ভাবাবস্থা দেখা যেতে লাগল। ভিন্ন ভিন্ন আসন ও মুদ্রার প্রকাশ তো বটেই, সমাধিস্থ অবস্থায় কেটে যায় সারা রাত কখনো বা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হয়ে সমস্ত শরীর হয়ে যায় নিস্প্রাণ হলুদ, কখনো বা শরীরে ফুটে ওঠে দিব্য এক জ্যোতি, প্রায় অনাহারেই কেটে যায় দিনের পর দিন। ভোলানাথ ততদিনে বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর সহধর্মিনী কোন সাধারণ নারী নন। তিনি এ বিশ্বনিয়ন্ত্রী সনাতনী শক্তির রূপধারিনী। তাই তিনি সসম্ভ্রমে তাঁর সাধনার মর্যাদা রক্ষা করে ছিলেন।

১৩২৯ সনের ঝুলন পূর্ণিমার দিন নির্মলা অনুভব করেন যে তাঁর মধ্যে সুপ্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ জেগে ওঠার সময় হয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি বলেন যে ওই মুহূর্তটিতেই তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। এ দীক্ষা আমরা সচরাচর গুরু দীক্ষা বলতে যা বুঝি তা নয়। মা স্বয়ং কখনো এর রহস্য সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেননি। হয়তো অনির্বচনীয় এই মুহূর্তের ভাষায়

ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। মা এই ঘটনার বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন যে পুকুরে স্নান করে এসে তাঁর ইচ্ছা (খেয়াল) হয় যে দীক্ষা নিয়ে সাধনা করবেন। তবে কর্মক্লান্ত স্বামী সারাদিন পরে ঘরে ফিরবেন, তাঁর যত্নের ত্রুটি যেন না হয় ভেবে নির্মলা ঘরে ফিরে আসা স্বামীর বিশ্রাম ও সেবাশুশ্রূষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গুছিয়ে হুঁকোটিও সাজিয়ে রাখার পর ভোলানাথের কাছে একটুক্ষণ সাধনা করার অনুমতি চান। ভোলানাথের অনুমতি পেয়ে তিনি ঘরের কোণে করে আসন করে মৃদুকণ্ঠে হরিনাম আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ঈশ্বর চেতনায় নিমজ্জিত হয়ে যান। এর বেশী তিনি কখনো কিছু বলেননি। নিজেকে তিনি আমি বলে উল্লেখ করতেন না; বলতেন "এই শরীরটা"। সেইজন্য আমাদের বোধের অগম্য তাঁর কোনো ব্যবহার বা কথা বুঝিয়ে দিতে বললে তিনি সহাস্যে বলতেন "এই শরীরটার সবই উল্টাপাল্টা"। এই উল্টাপাল্টা শব্দটি দিয়ে তিনি যে দিকে নির্দেশ করতেন, তা হল যে অসীম, অধ্যাত্ম জগৎ, যাকে ইংরাজীতে esoteric বলা হয়, তা আমাদের সীমিত জগতের ভাষায় যৌক্তিক বা তর্কগ্রাহ্য কার্য কারণ দিয়ে বোঝা যায়না। এর ইংরাজী পরিভাষা suprarational – যুক্তির ঊর্ধ্বে কিন্তু তা যুক্তিবহির্ভূত বা irrational নয়। দীক্ষার সেই মুহূর্ত হতেই তাঁর মুখ থেকে সংস্কৃত স্তব স্তোত্র আপনা হতেই অবিরাম উচ্চারিত হতে থাকে। আহার কমতে কমতে প্রায় অনাহারের পর্যায়ে চলে যায়। সারাদিন রাতে মাত্র তিনটি কণা ভাত খেয়ে দিন কাটে তখন তাঁর। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি সম্পূর্ণ মৌন হয়ে যান। প্রায় তিন বছর আর তিনি কথা বলেন নি। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে মৌন হয়ে যাওয়া কি মৌন ব্রত ধারণ করাটা মায়ের স্বভাবের একটি বিশেষ দিক। তিনি বলতেন যে মৌন থাকলে মনটা অন্যান্য বিষয়ের দিক হতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের দিকে দেওয়া যায়। তিনি নিজে তো মৌন থাকতেনই, কোনো কোনো আশ্রমিক বা আশ্রমিকাকেও অত্যন্ত, ক্ষুব্ধ বা উদ্বেলিত দেখলে মৌন থাকার আদেশ দিতেন। কোনো ক্ষেত্রে সে আদেশ কয়েক মাস বা বছর পর্যন্ত বহাল থাকত। পল্লীগ্রামের প্রতিবেশীদের চোখে তাঁর এইসব আচরণ যে অস্বাভাবিক লাগত বলা বাহুল্য, তাই তারা তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকে। নির্জনে মায়ের সাধনা আপনি এগিয়ে চলতে থাকে।

১৪৩০ বঙ্গাব্দে ভোলানাথ ঢাকার শাহবাগে একটি নবাবী আমলের বাগানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়ে মা'কে নিয়ে সেখানে বাসা বাঁধেন। এই সময়েই মা'র ঐশী শক্তির স্ফুরণ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বাহ্যতঃ মা তখনও অন্তঃপুরিকা গৃহবধূ – চওড়া লালপাড় শাড়ীর ঘোমটায় ঢাকা তাঁর মুখে শান্ত সলজ্জ ভাব, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ – চুপচাপ একমনে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করেন। তবু চোখে পড়ে যে তিনি যেন সবার হতে আলাদা, নিত্য নিরাসক্ত; হঠাৎ হঠাৎ তার ভাব সমাধি হয়, বায়ুতাড়িত পাতাটির মত তাঁর শরীর আপনা আপনি ঘোরে, দিব্য জ্যোতিতে মুখ ঝলমল করে। সারাদিন অনাহারে থাকলেও তাঁর চারিপাশের সকলে ভোজনে তৃপ্ত হলেই তাঁর মুখে তৃপ্তি দেখা যায় – অনাহার বা অনিদ্রাসত্ত্বেও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। অথচ বাগানের গাছপালায় সামান্য আঘাত লাগলেও মায়ের গায়ে তার দাগ ফুটে ওঠে। তাঁর স্নেহময়ী মাতৃরূপের কাছে জাতি ধর্ম ভেদ দেখা যায়না। শাহবাগেই তখন থাকেন এক বৃদ্ধ মুসলমান ফকির; মা তাঁকে বলেন পিতাজী, বৃদ্ধ তাঁকে কন্যা সম্বোধন করেন। পরে নিজের এই অবস্থার বর্ণনা মা নিজেই দিয়েছেন, "এই শরীরটার কি রকম হইত জানো ? জল দেখিয়া, আগুন দেখিয় ! বা বাতাসের সঙ্গে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া ! যাইত। যেন এই শরীরটাই নদীর ঢেউ বা আগুনের মূর্তি অথবা বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অতি সামান্য ভাবে মাটির সঙ্গে পায়ের স্পর্শ আছে, সেই অবস্থার শরীরট ! বাতাসের মতো এদিক-ওদিক চলিতেছে কিন্তু পড়িয়া যায় না। তাহার কারণ শরীরটা বাতাসের মতো হাল্কা হইয়া গিয়াছে। এইরকম নদীতে নৌকায় গেলে শরীরের গতি এমন হইয়া যাইত যে নদীর জলে মিশিয়া যাইতে চাহিত। সেইভাবেই শরীরে এমন একটা অস্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ হইত যে কেহ ধরিয়া রাখিতে পাবিত না। আপনা হইতেই সে-ভাবটা আবার থামিয়া যাইত।" "এই সব ভাব ধরা বড় মুশকিল। এই মহান ভাবের খেলা ! যাহার মধ্যে আপনি-আপনি হইয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যেও কখনো-কখনো ! লৌকিক ভাবের আভাস পাওয়া যায়। কারণ লৌকিক অলৌকিক যুগপৎ দুই ভাবের খেলাই যে তাহার মধ্যে হইয়া যাইতে পাবে। স্বাভাবিক গতিতে এমন সুন্দর এই যে হাত-পা, এ সমস্ত লইয়া যেন মহাপ্রকৃতি খেলা করিতেছে। সামান্য একটু ইচ্ছা থাকিলেও মহান ভাবের খেলা তাহার মধ্যে হইতে পারে না।" এই লৌকিক অলৌকিকের যুগ্ম লীলাই মায়ের

জীবনরহস্য। আমাদের পক্ষে এ রহস্য সম্পূর্ণ বোঝা অসম্ভব প্রায়। গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই কথাটিই উচ্চারিত হয়েছিল –

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীম তনু আশ্রিতম
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম . ৯/১১

অজ্ঞ জনেরা আমার মানব রূপ দেখে আমাকে অবহেলা করে। তারা জানেনা যে আমিই পরমেশ্বর, সকল সত্ত্বার আধার সেই পরম সত্ত্বা।

এই সময় মা একদিন ভোলানাথকে একটি অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের সন্ধান দেন। মন্দিরটি তিনি বাজিতপুরে থাকাকালীন স্বপ্নে দেখেছিলেন। শাহবাগে থাকার সময়ে আপন খেয়ালে তিনি ভোলানাথকে নিয়ে একটি জঙ্গলে গিয়ে সেখানে মাটিতে হাত রেখে বসার সময় দেখেন যে নরম মাটিতে হাত বসে গিয়ে মাটির ভিতর হতে রক্ত বের হচ্ছে। সেটিই ছিল সেই স্বপ্নে দেখা জীর্ণ মন্দিরটির দাওয়া। মা সেই নির্জন বনে একাকী সাত দিন কাটান এবং পরে সেই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির রূপে সেটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির ঘিরে আর মায়ের মধুর কণ্ঠে কীর্তন গানের এবং ঈশ্বরকথার আকর্ষণে সেখানে একটি বিশিষ্ট ভক্ত গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ক্রমশঃ ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে আর তাদের মাধ্যমে মায়ের কথা পূর্ববঙ্গের দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর শ্বশুরালয়ের আত্মীয়বর্গও তখন "বৌঠাকুরাণী"র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে আর ভোলানাথকে ঘিরে থাকেন। মাকে তখনও আনন্দময়ী নামে কেউ চেনে না। 'ঢাকার মা' বলেই তাঁর কথা উল্লেখ করা হত। কিছু লোক তাঁকে 'মানুষ কালী' বলেও বর্ণনা করতেন। খ্যাতি ও ভক্ত সমাগম বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও মা কিন্তু থাকেন আগের মতই উদাসীন, নিরাসক্ত। কারুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেননা। তখনকার মায়ের ভক্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আজীবন মায়ের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ পরবর্তী কালে মা'র জীবনে এঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনজনের মাঝে প্রথম যাঁর নাম করা যায়, তিনি ছিলেন একাধারে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য ও মায়ের একান্ত ভক্ত – শ্রী প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, এঁকে বলা যায় মায়ের অলৌকিক লীলার প্রথম ভাষ্যকার। মা'কে প্রথম দর্শন মাত্র যিনি জগজ্জননী মহাশক্তি রূপে চিনে নিয়েছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিয়ে নিয়ে অন্যান্য সকলকেও সে বিষয়ে নিসন্দিগ্ধ করেছিলেন। তারপর নাম নেওয়া যায় মায়ের সর্বদা সহচরী ডাক্তার শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আদরিনী বা খুকুনীর। প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী ও বুদ্ধিমতী এই মহিলার বাল্যকালে বিবাহের অনুষ্ঠান হলেও তিনি ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারিণী ও মায়ের সবচেয়ে নিকটসঙ্গিনী। মায়ের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা পাওয়ার পর তাঁর নাম হয় গুরুপ্রিয়া। আশ্রমের সকলে ও মা নিজেও তাঁকে দিদি সম্বোধন করতেন। সবশেষে যাঁর কথা না বললেই নয়, তাঁর নাম শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র রায়, যাঁকে সকলে ভাইজী বলে উল্লেখ করেন। এই শেষোক্ত ভক্তটি প্রথম দর্শন থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মা'র কাছে শিশুর বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ নির্দ্বিধায় ত্যাগ করে, স্ত্রী, পুত্র পরিবার সবকিছু ছেড়ে কেবল মায়ের সেবায় নিমজ্জিত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটিয়েছিলেন। শাহবাগে থাকা কালীন এই ভাইজীই একদিন মা'কে আনন্দের উৎস জগজ্জননী "আনন্দময়ী" রূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং মা'কে আনন্দময়ী নামে তিনিই প্রথম সম্বোধিত করেন। এই সময় হতেই সকলের কাছে তাঁর পরিচয় হয় আনন্দময়ী মা।

অন্তঃপুরচারিনী মায়ের এই বহির্প্রকাশের সময় হতেই তাঁর ভক্তরা মায়ের জন্য একটি আশ্রম স্থাপনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম আশ্রম স্থাপনা হয় ঢাকার রমনায়। মা নিজে এই বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। বস্তুতঃ এইসময় হতেই যেমন দিন যাচ্ছিল, তেমন তেমন মায়ের ব্যবহারে একটি অনিকেত পরিযায়ী প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছিল। যে অসীম সত্ত্বার তিনি মূর্ত রূপ, সে সত্ত্বার তখন সীমিত বাঁধন কাটিয়ে ওঠার সময় দেখা দিয়েছিল। ঢাকার থেকে তিনি বারে বারেই কোন তীর্থে চলে যেতেন, আবার ফিরে আসতেন। এই হঠাৎ খেয়ালের তালেই এর পর হতে মায়ের জীবন কেটেছে। তাঁর দেহাবস্থায় তাঁর ভক্তরা তাঁর জন্য বিভিন্ন জায়গায় বহু আশ্রম স্থাপনা করেছেন, কিন্তু মা কখনো কোন আশ্রমে নির্দিষ্ট

সময়ের জন্য একভাবে বাস করেননি। ভক্ত মন্ডলী পরিবৃত হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যে কোনো সময়ে কাউকে কোনো সূচনা না দিয়েই অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন – তাঁর সাথে থেকেছেন একটি বা দুটি নিকট সহচর বা অনুগামিনী। সর্বদা যে এরকম করেছেন, তা নয়, তবু মা কে কোন ধরা বাঁধা নিয়মে ফেলা যায়নি। মায়ের ভক্তরা এই দিকটির নাম দিয়েছিল মায়ের "খেয়াল"। এই "খেয়াল" শুনলে মনে হয় বুঝি বা বলা হচ্ছে এটি মায়ের খামখেয়াল, কিন্তু তা নয়; বরং কবির গানে যাকে বলা হয়েছে, "অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটা" জেগে ওঠে, এটি সেই হিল্লোল। আমাদের দৈনন্দিনের কার্য কারণে এর হিসাব মিলত না।

অপর পক্ষে, মা ছিলেন অসাধারণ ব্যবস্থাপিকা। গার্হস্থ্যজীবনে যে স্বভাব নৈপুণ্য ছিল তাঁর, তেমনি নৈপুণ্যে তিনি তাঁর বিভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে নানান অনুষ্ঠান, সাধুসেবা, নানান ধার্মিক উৎসব নানান কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা ও আয়োজন করেছেন; সে সব অবসরে যে কোন বিষয়েই মা প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আশ্রমে কোন আয়োজন হয়েছে আর মা হঠাৎ হঠাৎ ঘর হতে বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে সব দিকে নজর রাখছেন। কোন ঋতুতেই এর অন্যথা দেখিনি। মনে পড়ে গ্রীষ্ম কালে রোদের তাপ হতে আড়াল করার জন্য একটি হলুদ তোয়ালেতে তাঁর মাথা ঢাকা; শেষ বয়সে ভরা দুপুরে চোখে তাঁর থাকত কালো চশমা, কিন্তু চঞ্চল পায়ে আশ্রমের চারিদিক ঘুরে পরিদর্শন করা চলতে থাকত। বৃদ্ধ অসুস্থ সাধু সন্ন্যাসীদের বা আশ্রমবাসী ভক্তদের দেখাশোনা, সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থাপনা মা নিজে করতেন। কোথাও কোন ত্রুটি হতে পারত না। আরেকটি কথা এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়। মা নিজে জাতি ধর্মের ভেদ মানতেন না; তাঁর বিদেশী ভক্তের সংখ্যা ছিল অগণ্য, কিন্তু আশ্রম পরিসরে তো বটেই, বাহিরেও সর্বত্রই আশ্রমিকদের মা রীতিমত নিয়ম নিষ্ঠা রক্ষা করতে বলতেন। আমার দাদামশায় গোপাল প্রসাদ ছিলেন মায়ের বিশেষ ভক্ত। তিনি এক সময়ে এই নিয়ে মা'র কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অন্যান্য অনেকেও মা'কে এই নিয়ে প্রশ্ন করেছে। সকলকেই উত্তরে মা বলতেন নিয়ম নিষ্ঠার বাঁধন না থাকলে উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কা থাকে, তাতে সাধন ভজনের বিঘ্ন হয়। আবার আগে যেমন বলেছি, মা নিজের খেয়ালেই হয়তো কারুকে দেখা দিতে বা সম্পূর্ণ অকারণে হঠাৎ কোথাও চলে গিয়েছেন, অতর্কিতে দেখা দিয়েছেন, কাছে টেনে নিয়েছেন। বলেছি তো খন্ডের প্রেক্ষাপটে অখন্ডকে বোঝা মুশকিল। কার্য কারণের মাপদন্ড দিয়ে তাঁকে মাপা অসম্ভব। ওই যে গানটি আছে, "খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে" – মায়ের কথা ভাবলে আমার সেই গানটি মনে পড়ে যায়। সীমার মাঝে তাঁর অসীম সুর চিরকাল খেলা করে গিয়েছে।

মা'র এই লীলা ভাল করে বুঝতে আবার ফিরে আসি মায়ের জীবনকথায়। রমনায় প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কীর্তন করতে করতে মায়ের ভক্তেরা মা'কে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। পরের দিন মধ্যরাত্রে মা সকলকে বললেন যে "এবার আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, তা নাহলে আমি শরীর ছেড়ে চলে যাব।" সে রাত্রেই একবস্ত্রে মা ঢাকা ছেড়ে গেলেন। স্টেশনে গিয়ে যে গাড়ী পেলেন, তাতেই উঠে বসলেন। সাথে রইলেন কেবল ভোলানাথ আর ভাইজী। মায়ের এধরনের খেয়ালের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে ভোলানাথ মৃদু প্রতিবাদ করতেন। তার পর নিজের সহধর্মিনীর ইচ্ছাকে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছারূপে স্বীকার করে নিয়ে নিঃশব্দে তাঁর অনুগমন করতেন। মা নিজেই পরে কতবার বলেছেন, "যা দেখ, সবই শরীরের খেলা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কারও সঙ্গে এ শরীরটার এতটুকু সম্বন্ধ বা বন্ধন নেই, এ শরীরের আত্মীয় বা অনাত্মীয় প্রত্যেকের সাথে এক ভাব, কোন পার্থক্য বুঝিনা, তাই সকলকে নিয়ে আছি। কাকে ছাড়া হবে, কাকেই বা ধরা হবে !" মায়ের দীক্ষা গ্রহণের পর দ্বিতীয় বছরে ভোলানাথ নিজেও মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে গুরু রূপে মান্য করতেন। ভোলানাথের দেহ রাখার পরে মায়ের মা মোক্ষদাসুন্দরী মেয়েকে ছেড়ে যেতে আলাদা যেতে চাননি বলে মা তাঁকেও সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়ে নিজের সাথে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।

ঢাকা ছেড়ে কাটিহার, দেরাদুন, লখনৌ উত্তরকাশী নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা এলেন বৈদ্যনাথে। এইখানে বনজঙ্গলে ঘেরা একটি পার্ব্বত্য গুহায় মা'র মাঝে যে দৈবী শক্তির আত্মপ্রকাশ চলেছিল, তার চূড়ান্ত সময় দেখা দিল।

দীর্ঘ তিন বৎসর মা এখানে নানান রহস্যময় যৌগিক সাধনায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন। শোনা যায় যে অনেকসময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাঁর শরীরটি মাটিতে লুটিয়ে ধুলায় মাখামাখি হয়ে থাকত। সঙ্গী ভোলানাথ ও ভাইজী সতর্ক ভাবে তাঁকে পাহারা দিতেন, যাতে কোনো বন্য জন্তু তাঁর ক্ষতি না করে বা তিনি গুহা হতে বাইরে না পড়ে যান।

তিন বৎসর পর মা আবার বাহ্য জীবনে ফিরে আসেন ও তাঁরা তিনজন লোকালয়ে যোগ দেন। এরপর তাঁরা ইতস্ততঃ নানান শহরে ঘুরে দেরাদুনের কাছে রায়পুর নামে একটি ছোট্ট শহরে আসেন। ভোলানাথ এইসময়টিতে উত্তরকাশী চলে যান, এবং নিজের সাধনায় মগ্ন হয়ে যান। মা থাকেন ভাইজীর তত্ত্বাবধানে। ওই গ্রামের স্ত্রীলোকরা মা'কে সখীর মত ঘিরে রাখেন। এইসময় শ্রী জহরলাল নেহেরুর স্ত্রী কমলা নেহেরুর সাথে মায়ের পরিচয় হয়। দর্শন মাত্র কমলা মায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন – গভীর ও তুলনাবিহীন ছিল সে অনুরক্তি। কমলার জীবনের শেষটুকু কেটেছে মায়ের উপদেশ শুনে; শুধু তাই নয় তাঁর প্রভাবে তাঁর স্বামী জওয়াহরলাল ও কন্যা ইন্দিরাও মায়ের পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। কমলার সূত্রেই সে সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা এবং তা ছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু কাশ্মীরী পরিবার মায়ের ভক্ত হয়ে যান। শুনেছি যে নেহেরু পরিবারের কাছে মায়ের কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী তাঁর একান্ত সচিব যমুনা লাল বজাজকে মায়ের কাছে যাওয়ার অনুরোধ করেন। যমুনা লালজী মায়ের সান্নিধ্যে এসে অভিভূত হয়ে পড়েন ও মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করেন। বজাজজীর অকাল মৃত্যুর পর মা তাঁর অনুরোধ স্মরণ করে ওয়ার্ধার গান্ধী আশ্রমে গিয়ে গান্ধীজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেই মাতৃসঙ্গ মহাত্মাকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করে। শোনা যায় যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসও ১৯৩৮ সনে মায়ের কাছে এসে তাঁকে দর্শন করে যান। বাস্তবপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু পুরোধারাই মায়ের কাছে কোন না কোন সময়ে এসে মা'কে দর্শন করে মায়ের উপদেশ শুনে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছেন । এর পর দেশ স্বাধীন হলে, স্বাধীন ভারতের প্রত্যেকটি নেতাই মায়ের আশীর্বাদ নিতে আসতেন। অথচ মা ছিলেন রাজনীতির উর্দ্ধে , চির নির্লিপ্ত। এই সব নেতাদের কারুর সাথেই তিনি রাজনীতির আলোচনা করতেন না বা সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতেন না। তাঁর সকল আলোচনা, সকল উপদেশ, সকল আলোচনাই হতো কেবল ঈশ্বর ভক্তি ও ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকে কেন্দ্র করে।

কনখলে নির্জনে তিন বৎসর সাধনা করে ভোলানাথের সাধনা কাল পূর্ণ হলে পর ভোলানাথ সমতলে নেমে আসেন আর মা আবার পরিব্রাজন শুরু করেন। ১৯৩৯ সনের মে মাসে (২৩শে বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে) কনখলে ভোলানাথ পরলোক গমন করলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মা তাঁর সেবা করেছেন। মায়ের প্রসাদ পেয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে "আনন্দ আনন্দ" উচ্চারণ করতে করতে তিনি দেহ রাখেন। তার পর হতে মা আবার নিজের খেয়ালে পরিব্রাজন করতে থাকেন। এই সময় হতে তাঁর মা মোক্ষদাসুন্দরী সন্ন্যাস নিয়ে মুক্তানন্দ গিরি নাম ধারণ করে আশ্রমবাসিনী হন। সাধারণ ভক্তরা অবশ্য তাঁকে দিদিমা সম্বোধন করতেন। মা সাধারণতঃ মন্ত্রদীক্ষা দিদিমাকে দিয়ে দেওয়াতেন। খুব অন্তরঙ্গ একটি কি দুটি লোক মায়ের নিজের কাছ হতে দীক্ষা পেয়েছে। মায়ের যেমন কঠিন কথাকে সহজে বুঝিয়ে বলার রীতি ছিল, তিনি মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতেন এই বলে, "মন তোর – এই হল মন্তর" অর্থাৎ মন্ত্র হল ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত চিত্ত হওয়ার সাধন মাত্র। ঈশ্বর কৃপা কখন আসবে, সেটি বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলতেন কৃপা শব্দটির মধ্যেই ঈশ্বরকে পাওয়ার রহস্য রয়েছে। কৃ অর্থাৎ করো মানে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করো, তাহলেই "পা" তাঁকে পাবে। দুঃখ দূর হবে কিসে জানতে চাইলে বলতেন, দুঃ মানে দুই কে দূর করে দাও – দুই থেকে একে যাত্রাই হল দুঃখ দূরের উপায়। উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম" সূত্রটি এমনি সহজ ভাষায় ব্যক্ত হত তাঁর মুখে। মায়ের এই সহজ ভাষায় নিগূঢ় সত্যের ব্যাখ্যা শুনতে মা এসেছেন শুনলে ভক্তেরা সেখানে ছুটে আসতেন।

মায়ের পর্যটনের সঙ্গী কে কখন হবে জানা থাকত না। অনেক সময়ই বিরাট এক ভক্ত মন্ডলী তাঁকে ঘিরে থাকত; সে মন্ডলীর ভিতর হয়তো নানান দেশ, নানান ভাষার লোক থাকত, যাদের মধ্যে অনেকেই একজন আরেকজনকে চিনত না। আবার কখনো একটি কি দুটি সঙ্গী নিয়ে মা হঠাৎ অন্য কোথাও চলে যেতেন। গুরুপ্রিয়া দিদি অনেক সময় সাথে থাকতেন, অনেক সময় থাকতেন না।

যেহেতু শৈশব হতে মায়ের বেনারস আশ্রমের আবহে বড় হয়েছি, এমন অনেক মাতৃদর্শনার্থীকে দেখতে পেতাম, যাঁরা সে সময় রাজনীতি বা অন্যান্য ক্ষমতার জগতে বিখ্যাত; কিন্তু মায়ের কাছে তাঁরা আসতেন ভক্তিনম্র হয়ে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতাম আধঘোমটা টেনে অবনত ভঙ্গীতে মায়ের দর্শন করতে আসছেন, হাতে রয়েছে ফুলের মালা, গলায় থাকত মায়ের আশীর্বাদপূত রুদ্রাক্ষের মালাটি। শুনেছি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে যাওয়ার সময়েও ওই মালা তাঁর গলায় ছিল। এখনো এলাহাবাদে তাঁদের পৈত্রিক আবাস আনন্দ ভবনে সেই মালাটি বিছানার পাশে সযত্নে রাখা রয়েছে। এছাড়া আসতেন রাজা মহারাজারা ও তাদের পরিবার বর্গ। আশ্রমপ্রাঙ্গণে খেলা করতে করতে চোখে পড়ত ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার মা ললিতা দেবী এসে মায়ের ভক্তমন্ডলীর একপাশে বসেছেন। কখনো বা দেখতাম সোলোনের মহারানী এলেন। সোলোনের মহারাজা, যাঁকে আশ্রমে যোগীভাই বলে সম্বোধন করা হত, প্রতি গ্রীষ্মকালে মা ও তাঁর ভক্তদের নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন।

শুনতাম মায়ের কাছে সাধু মহাত্মা মঠাধীশেরা আসতেন, দুরূহ শাস্ত্র আলোচনা করতেন, সাধন পথের মার্গ নির্দেশন চাইতেন। পূর্ববঙ্গের সেই সহজ সরল এককালের গ্রাম্যবধূ অনায়াসে অবাধে তাঁদের সাথে কঠিন হতে কঠিনতর বিষয় নিয়ে কথা বলতেন, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের শ্লোকের উদ্ধৃতি দিতেন। প্রথম দিকে অবশ্য মা'কে চিনে নিতে সাধক ও মঠাধীশেদের সময় লেগেছিল, কারণ তাঁরা মনে করতেন যে মা সাধারণ এক গৃহবধূ। তার পর ১৯৪০ সনে ঝুঁসিতে বিখ্যাত সাধু প্রভুদত্তাজি মহারাজের সাথে মায়ের দেখা হয়। দেখা মাত্র দত্তাজী মায়ের অনন্ত শক্তি অনুভব করতে পারেন ও মা'কে ১৯৪৪ সনে এলাহাবাদে সাধুসমাজের গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। মা সেই গোষ্ঠীতে উপস্থিত হওয়ার পর ভারতের সর্বমান্য সাধকেরা যেমন চক্রপাণি মহারাজ, শরনানন্দ মহারাজ আর হরিবাবাজী মহারাজ তাঁকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁদের মনে হয় যে মায়ের বাণী উপনিষদের শাস্ত্রবাক্যের মূর্ত প্রতীক, তাই তাঁরা মায়ের স্থান সর্ব্বোচ্চ সাধকদের মাঝে নির্দিষ্ট করেন। মহাকুম্ভ স্নানে সর্ব প্রথম জলে নামার অধিকার একমাত্র নির্বাণী আখড়ার মহামন্ডলেশ্বর ও অন্যান্য প্রখ্যাত মন্ডলেশ্বরদের। স্নানের সেই দূর্লভ অধিকার ভাগ করে নিলেন সেই আনন্দময়ী মায়ের সাথে যাঁকে তাঁরা আগে গৃহবধূ ভাবতেন। এঁরা বিভিন্ন ধারার উপাসক হলেও মাকে নিজ নিজ ধারার উপাস্য দেবী হিসাবে প্রত্যক্ষ করতেন। অথচ মা বলতেন যে তিনি নিজে কোন বিশেষ দেবী বা দেবতাকে লক্ষ্য করে উপাসনা করেননি। তিনি নাম করতে করতে সেই শব্দের মাঝে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন – রূপের মাঝে অরূপের সন্ধান পেয়েছেন। মায়ের কথায় "ডাকার মতন ডাকলে, ডাক মাত্র একটি ! সেই ডাকটির জন্যই নানাজাতির ভিতর রয়েছে নানা ব্যবস্থা। যেদিন কারো সে ডাকটি আসে সেদিন আর তাঁর ডাকাডাকি থাকে না।" সকল ধর্ম, সকল মত মায়ের কাছে ছিল সমান, কারণ তাঁর কাছে সকলই এক – সেই একের উদ্দেশ্যে সকলের যাত্রা। তাঁর মুখে শোনা যেত "যে ভগবৎ প্রেমে সর্বত্যাগী যাঁর চোখে ভগবান সর্বময়, তার স্থান সর্বত্রই সুলভ। মনকে নিয়মিত করে সকল অবস্থার উপরে উঠবার চেষ্টা করো, তাহলে স্থান অবস্থানের দ্বন্দ যাবে ঘুচে।"

এ তো গেল সাধু সন্তদের সাথে মায়ের আলোচনার কথা। মায়ের আশ্রমে দেখেছি ত্রিগুণা সেন, গৌৰীনাথ শাস্ত্রী, গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মাথা নত করে এসে বসতে। দেখেছি আমার গুরুদেব ভারতবিখ্যাত পন্ডিত ও সাধক গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে শিশুর মত সরল হাসিতে মাকে প্রণাম করতে। তাঁকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ও সাধকশ্রেষ্ঠ বলে সারা ভারতের বিদ্বৎসমাজ শ্রদ্ধা করত। মায়ের সামনে আসলে সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ বয়সেও শিশু হয়ে যেতেন। শুনেছি মায়ের সাথে গুহ্য সাধনার রহস্য নিয়ে তাঁর নানা আলোচনা হত, কিন্তু আমি দেখতাম যে, মা'কে দেখলেই তিনি সহাস্যে দুটি হাত জোড় করে মাথা নোয়াতেন এবং মা'র সস্নেহে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। এই দৃশ্যটি আজও আমার মনে আছে।

অপরপক্ষে জ্ঞানী নয়, ধনী নয়, এমন নিতান্ত দরিদ্র কিম্বা অবহেলিত জনেরাও মায়ের কাছে সমান আদর পেত দেখেছি। বহুদিন আগে বিন্ধ্যাচলের নির্জন আশ্রমে এক রাত্রে আশ্রমের পাহারায় থাকা এক জেলখাটা ডাকাত সর্দারকে

গ্রাম্য ভাষায় মায়ের স্নেহের গল্প করতে করতে আত্মহারা হয়ে যেতে দেখেছিলাম। গঙ্গার ঘাটের মাঝি মাল্লা, আশ্রমের দরজায় ফুলের মালা বিক্রী করনেওয়ালী, মায়ের কাছে সকলের অবারিত দ্বার। মা যখন আশ্রম ছেড়ে কোথাও রওয়ানা হতেন, অনেক সময়ে দেখতাম যে তিনি আশ্রমের লতা পাতা গাছ গাছালির কাছ হতে করজোড়ে বিদায় চাইতেন। শুধু কি গাছপালা, আশ্রমের প্রবীণ সন্ন্যাসী নারায়ন স্বামী লিখেছেন যে একবার বৃন্দাবনে গিয়ে মা একটি ঘরে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় স্বামীজীকে ডেকে বললেন যে সামনের দরজাটি যেন খুলে দেওয়া হয়। দরজা খোলা মাত্র একটি ছোট্ট কালো রঙের হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে মায়ের কোলে মাথা রেখে খানিক আদর খেয়ে তেমনি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

এমন কি শুধু শরীরী নয়, অনেক অশরীরী আত্মাও মায়ের কাছে মুক্তির জন্য দীক্ষা চাইতে আসতেন বলে শুনেছি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা যে, মা রাত্রে খুব কম ঘুমাতেন আর সেই সময় সেসব মুক্তিকামী আত্মাদের সাথে তাঁর নিঃশব্দ কথোপকথন হতো। নিজে যেটুকু দেখেছি তা হল যে পরের দিন সকালে মা সেই সব আত্মাদের উদ্দেশ্যে তুলসী পাতায় মন্ত্র লিখে উপস্থিত কোনো ভক্তকে দিতেন।

মা কার মা ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি কখনও। আমার জন্মের আগে থেকে আমাদের পরিবার মায়ের আশ্রমকে ঘরবাড়ী বলে জেনেছে। শুনেছিলাম যে আমার দাদামশায় বেনারসের প্রসিদ্ধ ডাক্তার গোপাল প্রসাদ দাশগুপ্ত এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে প্রথম মায়ের শরণাগত হন। অতি শৈশবে মাতৃহারা হওয়ার জন্য মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত থেকে যাওয়ায় আমার দাদামশায়ের ছিল ঈশ্বরের প্রতি দুরন্ত অভিমান ও অবিশ্বাস। মন্দির ও দেবদর্শন থেকে তিনি দূরে থাকতেন, তবে তিনি ছিলেন অসামান্য মানবদরদী ও জনহিতকর কাজে ব্রতী। একবার যখন দুরারোগ্য রোগে দাদামশায়ের প্রাণসংশয় হয়, সেই সময় এক মাতৃমূর্তি আবির্ভূত হয়ে তাঁর মুখে প্রসাদ দিয়ে মিষ্টি কথায় তাঁকে রোগমুক্তির আশ্বাস দিয়ে মিলিয়ে যান। দাদামশায় ধরে নেন ঐ মাতৃমূর্তিরূপে তাঁর পরলোকগতা জননী সন্তানের কষ্ট দূর করে গেলেন। কিছু দিন পর মা যখন বেনারসে আসেন, তখন তাঁর একটি অসুখের চিকিৎসার জন্য দাদামশায়ের ডাক পড়ে। মা তখন অবগুণ্ঠনবতী, থাকতেন গঙ্গাবক্ষে বজরায়। সেই সময় দাদামশায় তাঁকে সেই মাতৃমূর্তি হিসাবে চিনতে পারেন। আবাল্য দেখেছি যে মায়ের সাথে তাঁর ছিল এক অপূর্ব সম্পর্ক – একজন শিশু আর অন্যজন শিশুটির মা। মন্দির দর্শন, পূজার আড়ম্বরে দাদামশায় বিশ্বাস করেননি কোন দিন। মা'ই ছিলেন তাঁর জীবনের সর্বস্ব। এই দাদামশায় ও দিদিমার সাথে সাথে শিশুকাল হতে বেনারস আশ্রমের আঙিনায় খেলা করে আমাদের জীবন কেটেছে। যে কোনো পূজা, অনুষ্ঠান সেখানে কাটিয়েছি। মা যে ঐশী শক্তির মূর্তি, তা তখন বোঝবার বয়েস হয়নি। মনে পড়ে গঙ্গার ওপরের খোলা ছাদটিতে সন্ধ্যাবেলা মায়ের জন্য খাটের উপর শুভ্র সুন্দর বিছানা পাতা। মা এসে বসলেন। ভোলানাথ তখন আর দেহে নেই, তাই মায়ের পরনে সাদা শাড়ী। মায়ের অপরূপ সুন্দর মুখটি হাসিতে ভরা, একঢাল খোলা চুল পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। মায়ের সামনে কীর্তন চলেছে আর ছোট্ট আমি একপাশে কীর্তনের তালে ঘুরে ঘুরে নাচছি। মা নিজে মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছেন। যাঁরা দর্শন করতে আসছেন, মা'কে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। একসময় মা হঠাৎ হেসে উঠে আমাকে ডেকে বলছেন, "বন্ধু এদিকে এসো"। সব শিশুদেরই তিনি বন্ধু বলতেন। আমি কাছে আসতেই মাথার ঝুঁটি বাঁধা চুলে একটি মালা তুলে নিয়ে জড়িয়ে দিয়ে বলছেন, "আবার কবে আমার কাছে আসবে বন্ধু?" শিশু আমি এলেবেলে উত্তর দিচ্ছি আর মা হেসে উঠছেন। তাঁর হাসিটি ছিল বড় মধুর এবং তাঁর কৌতুকমধুর স্বভাবটির জন্য প্রায়ই তাঁর সেই হাসি শোনা যেত।

বড় হয়ে ওঠার পরেও আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে মা তেমনি কৌতুক করেছেন। গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বৃদ্ধ বয়েসের অসুস্থ হওয়ায় মা তাঁকে তাঁর সেবা শুশ্রূষার সুবিধার জন্য আশ্রমে এনে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। একদিন আমি কবিরাজ মশায়ের ঘরে বসে পাঠ নিচ্ছি। মা ঘরে এলেন, আমি প্রণাম করতে নীচু হতেই মা হেসে উঠলেন। আমার মাথায় ১৯৭০ এর দশকের কায়দায় নাইলনের বল বসানো মস্ত খোঁপা। মা বললেন, "বন্ধু কি আজ মাথায় গোবরের

চুপড়ি বসাইয়া আসছ নাকি ?" আমি তো মহা অপ্রস্তুত। মায়ের এই হাস্য সমুজ্জ্বল ক্রীড়াচঞ্চল রূপটি বিশেষ করে ফুটে উঠত যখন আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী বালিকাদের আবাসন কন্যাপীঠে কোন উৎসব হত। মায়ের ভক্ত ও অন্যতম জীবনীকার শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্তের আনন্দময়ী প্রসঙ্গ হতে একটি স্মৃতিচারণের উল্লেখ করলে এর একটি ছবি পাওয়া যাবে।

"কাশী আশ্রমে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব ৬ই ভাদ্র, সোমবার (ইং ২৩/৮/৫৪) গত শনিবার এবং রবিবার আশ্রমে জন্মাষ্টমী উৎসব হইয়াছে। যে গোপাল এইবার আশ্রমে আসিয়াছেন, তাঁহারই পূজা শনিবার রাত্রিতে চন্ডীমন্ডপে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। . . . ঐ দিন সারারাতই মেয়েরা কীর্তন করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীমা রাত্রি ৩টা পর্যন্ত কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন। . . . আজ সকালে নন্দোৎসব হইল। কন্যাপীঠের মধ্যেই এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল এবং ঐখানে মেয়েরা গান গাহিতেছিল। কিছুক্ষণ গান চলিলে মা হঠাৎ খেয়াল বশে সকলকে লইয়া আশ্রমে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে স্থানে বৃন্দাবন সাজান হইয়াছিল সেইখানে কীর্তন সহ মেয়েদের লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ছোট ছোট মেয়েদিগকে রাখাল বালকের সাজে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। তাহারা যখন গান ও নৃত্য করিয়া মাকে লইয়া ঘুরিতেছিল উহা যে কত সুন্দর দেখাইতেছিল তাহা প্রকাশ করা যায় না। মেয়েরা গাহিতেছিল –

ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ

শ্রীশ্রীমা নিজেও যেন ঐ রাখাল বালকদের একজন হইয়া কখনও ছোট ছোট মেয়েদের গলা ধরিয়া কখনও বা তাহাদের হাত ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিলেন। বড় বড় মেয়েরা যাহারা গান করিতেছিল তাহাদের মধ্যেও যেন দিব্য উন্মাদনার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই সঙ্গীতের তালে তালে ঈষৎ নৃত্য করিতেছিল। তাহাদের সকলের দৃষ্টিই মায়ের শ্রীমুখে নিবদ্ধ। আর মায়ের মুখমণ্ডলও তখন এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উহা দেখিয়া তখন কে বলিবে যে ইহা কোন মর্তবাসীর মূর্তি ? মুখমণ্ডলের ঐ দিব্য জ্যোতি, হস্তের ও দেহের সাবলীল ভঙ্গি, মন মাতান ঐ কণ্ঠস্বর – উহার কিছুই যে এই জগতের ছিল না। . . . মা আবার গান ধরিলেন – নিতাই ডাকে আয় আয়, গৌর ডাকে আয়। শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল। এত জোর গলায় মাকে বড় কীর্তন করিতে দেখি নাই। এমন সময় দধিভান্ড উপস্থিত হইলে ছোট ছোট মেয়েরা যাহারা রাখাল বালক সাজিয়াছিল, তাহারা দধিভান্ড মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মায়ের সম্মুখে দধিভান্ড ধরা হইলে মা ঐ ভান্ড হইতে দধি লইয়া সকলকে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। মেয়েদের মুখে হলুদ মিশ্রিত দধি লাগাইয়া দিতে লাগিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন – ধর লও ধর লও লওরে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়। কলসে কলসে ঢালে প্রেম তবু না ফুরায়। মায়ের দধিবর্ষণের ফলে সকলকেই তুষারাবৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ দধিবর্ষণ করিয়া মা আবার সকলকেই দধি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ছেলে মেয়েদিগকে মুখ খুলিতে বলিয়া তাহাদের মুখ গহ্বরে দধি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাহার ফলে তাহাদের নাক মুখ দধিময় হইয়া উঠিল। বৃদ্ধদিগকে নিজ হাতে দধি খাওয়াইয়া দিলেন। তাহারা দধির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের স্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। ইহার পর হরি বল, হরি বল, বলিয়া মা কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং ইঙ্গিতে সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে বলিলেন। আজ মায়ের ভাব দেখিয়া মনে হইল মা যেন কৃপা-কল্পতরু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং যোগ্য অযোগ্য বিবেচনা না করিয়া কৃপার প্লাবনে সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। কীর্তন শেষ হইলে মেয়েরা মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া "অখণ্ড মণ্ডলাকারং" ইত্যাদি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া নন্দোৎসব শেষ করিল।" কাশীর আশ্রমে এই ক্রীড়া চঞ্চলমূর্তিতে আনন্দের হিল্লোল তুলে মা পরের দিনই আবার বাঁধন কেটে এক আশ্রম ছেড়ে আরেক দিকে চলে গেলেন। "আজ বিকাল ৫টার সময় মা দিল্লি চলিয়া গেলেন। সেইখানে মায়ের যে নূতন আশ্রম হইয়াছে উহারই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাকে লইয়া যাওয়া হইল।"

সব উৎসবের সময়ই যে মা এইরকম খেলায় মেতে থাকতেন, তাও নয়। অনেক সময় দেখেছি আশ্রমে শিবরাত্রি বা দুর্গাপূজার সময় ভক্তেরা মা'কে দুর্গারূপে বা শিবরূপে সাজিয়ে চরণ বন্দনা করতেন, মা নিঃস্পৃহ ভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতেন; কখনো দেখা যেত তিনি সমাধিতে ডুবে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে ১৯৩৫ সনে কলকাতায় ভবানীপুরে পরমহংস যোগানন্দর সাথে সাক্ষাৎকার হওয়ার সময় মা যা বলেছিলেন। যোগানন্দ মাকে নিজের জীবনের কথা বলতে অনুরোধ করলে, মা বলেন, "বাবা বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। আমার জ্ঞান কখনও এই নশ্বর শরীরটার সাথে জড়িত হয়নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে বাবা আমি একই ছিলাম। যখন ছোট্ট একটি মেয়ে ছিলাম, তখনও সেই আবার যখন নারীত্বে পৌঁছলাম, তখনও সেই। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলাম, তাঁরা যখন বিয়ে দিতে চাইলেন, তখনও আমি সেই। আর এখন আপনার সামনে আমি সেইই আছি। এই অনন্তের কোলে আমাকে ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্য কালের জন্য সেই একই থাকব।"

আমি মায়ের শেষ দর্শন পাই ১৯৮১ সনে কাশীর আশ্রমে। কিন্তু তারও আগে ১৯৭৬ সনে আমার শ্বশুর ঘর ও তারপর আমেরিকা যাত্রার সময় পাওয়া দর্শন আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। যাত্রার আগে আশ্রমে গিয়ে কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করে উঠলাম বটে, কিন্তু মায়ের দেখা পাওয়া গেল না। রেলওয়ে স্টেশনে এসে দেখি আমার পাশের ক্যুপেতে মা দন্ডকারণ্য চলেছেন। ট্রেন চলতে শুরু করলে একজন এসে আমাকে আর আমার স্বামীকে মায়ের কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। প্রণাম করে পায়ের কাছে বসলাম। মাথায় হাত রেখে ভাবী সংসার জীবনের জন্য সহজ করে নানান উপদেশ দিলেন। জব্বলপুর স্টেশনে মা নেমে গেলেন। আমাকে দিয়ে গেলেন সারা জীবনের পাথেয়।

১৯৮২ সনের আগস্ট মাসে দূর হতে বসে খবর পেলাম কনখলে মা তাঁর ৮৬ বছরের অনিত্য দেহটি ত্যাগ করে নিত্যের মাঝে মিশে গেলেন। তাঁকে আজও বুকের মধ্যে অনুভব করি, তাঁর সাথে মনে মনে কথা বলি, নালিশ করি, অভিমান করি, ভয় পেলে ডাকি আবার প্রণাম জানাই। তবু আজও জানিনা মা কে, কি তাঁর স্বরূপ ! শুনেছি যে বাজিতপুরে একজনের এই প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠেছিলেন, "পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ"। তার পর এই নিয়ে কোন কথা বলেননি। আরেকবার একজন যখন জিজ্ঞেস করেছিল যে তোমার পূর্ণ স্বরূপ দেখাও না কেন, তখন সে উত্তর পেয়েছিল যে "সে রূপ তুমি কি সহ্য করতে পারবে ?" আবারও গীতার কথা মনে পড়ে যায়। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের আগ্রহে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, অর্জুন আকুল হয়ে বলেছিলেন, "এ রূপ তুমি সম্বরণ করো।" মা তেমনি নিজের পূর্ণ স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন, কারুর কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করেননি।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই মর্মে যা বলেছিলেন, তার থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করি। 'মা কে'?, 'মার স্বরূপ কি' ? – এইসকল গভীর বিষয়ের মীমাংসা অল্পজ্ঞান শিশুর পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। শিশুর যখন জন্ম হয় নাই, তখনও মা ছিলেন, শিশু যখন থাকিবে না, তখনও মা থাকিবেন। মা সনাতনী। . . . শিশু মা'কে প্রাপ্ত হইয়া মা'কে মা বলিয়া ডাকিয়া ও মায়ের আদর সোহাগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। মায়ের স্বরূপ পরিচয় না পাইলেই বা তাহার ক্ষতি কি ? কারণ, সে মায়ের বিশেষ পরিচয় না পাইলেও মা'কে নিজের স্নেহশালিনী আনন্দময়ী জননীরূপে চিনিতে পারে। ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, . . ."

আমার মা আনন্দময়ী, সেই পরিচয়েই আমি ধন্য।

মানস ঘোষ

নারী : অগ্নিকন্যা বীনা দাশ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। সেনেট হলে সেদিন সাজ সাজ রব। আসছেন গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন।

দিনটা ছিল ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২। মঞ্চে উপস্থিত গভর্নর, পাশেই উপাচার্য হাসান সুরাবর্দি। ছাত্রছাত্রীরা সমাবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট গাউনে সুসজ্জিত হয়ে বসে আছেন বেশ একটু পেছন দিকে। এর মধ্যেই একটি ছাত্রী উঠে সামনের সারিতে বসা অধ্যাপিকার থেকে জল চাইলেন। জল খাওয়া হলে, সামনেই একটা ফাঁকা সিট দেখে বসে পড়লেন।

বলতে শুরু করেছেন স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। ছাত্রীটি উঠে দাঁড়াল। লুকোনো পিস্তল বার করে গুলি চালালো চকিতে। গভর্নর স্ট্যানলি ছিলেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাঁর রিফ্লেক্স এর জন্যই হোক বা মেয়েটির নিশানার অভাবেই হোক, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটিকে ধরে ফেললেন হাসান সুরাবর্দি। মেয়েটিকে নিরস্ত্র করার আগেই আরও চারবার গুলির শব্দে কেঁপে উঠল সেনেট হল। সবকটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আজকে, এই ২০২৪ সালে আপাত নিশ্চিন্ত বসার ঘরে বসে কারো হয়ত মনে হবে, "এমন কী আর হল ? একটা গুলিও তো লাগল না!" তাঁদের জানাই গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও, সেদিনের সেই ছাত্রী, বীনা দাশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কেঁপে উঠেছিল ঐ পাঁচটি গুলির শব্দে।

গ্রেফতার করার পর বীনা দাশকে দিয়ে সঙ্গীদের নাম বলানোর চেষ্টা করা হল। রাজসাক্ষী হওয়ার প্রলোভন দেখানো হল। কিন্তু বীনা অনড়। শেষে বাবা বেণীমাধব দাশকে ডেকে পাঠানো হল মেয়েকে বোঝাবার জন্য। হায় দুরাশা! নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রিয় শিক্ষক বেণীমাধবও ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। বীনার মনোবল আরও বেড়ে গেল।

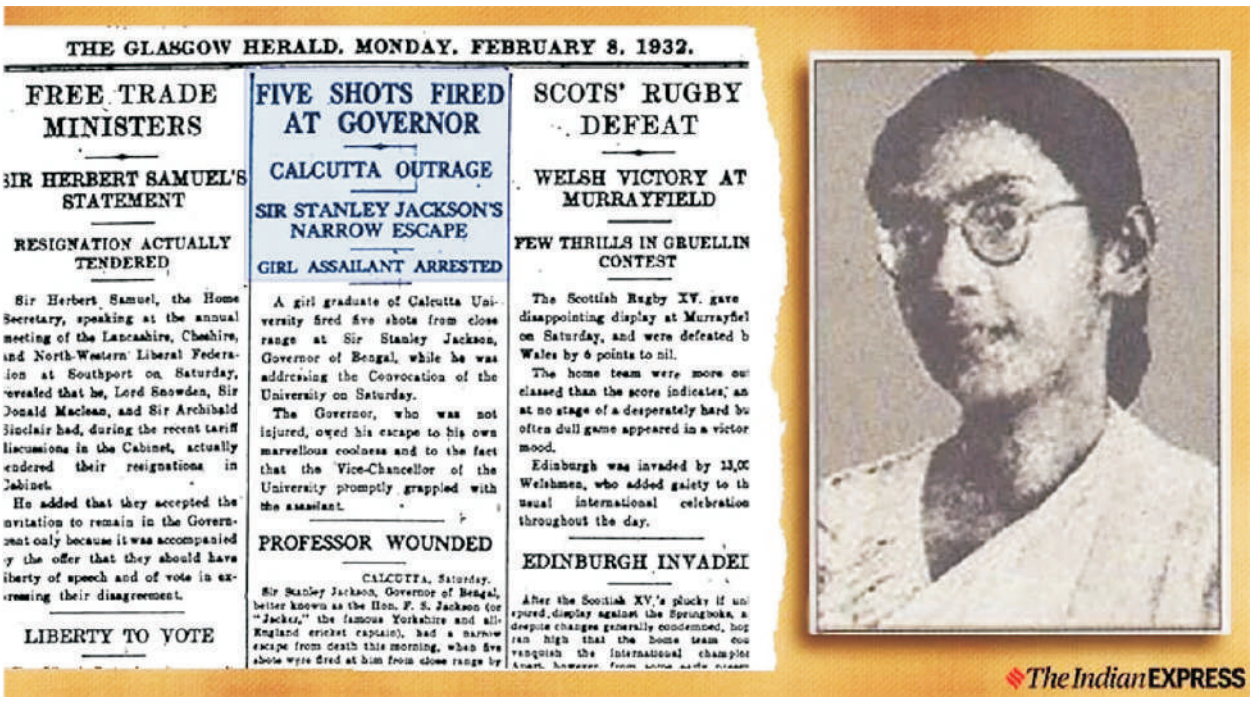

THE GLASGOW HERALD. MONDAY. FEBRUARY 8. 1932.

FREE TRADE MINISTERS

SIR HERBERT SAMUEL'S STATEMENT

RESIGNATION ACTUALLY TENDERED

Sir Herbert Samuel, the Home Secretary, speaking at the annual meeting of the Lancashire, Cheshire, and North-Western Liberal Federation at Southport on Saturday, revealed that he, Lord Snowden, Sir Donald Maclean, and Sir Archibald Sinclair had, during the recent tariff discussions in the Cabinet, actually tendered their resignations in Cabinet.

He added that they accepted the invitation to remain in the Government only because it was accompanied by the offer that they should have liberty of speech and of vote in expressing their disagreement.

LIBERTY TO VOTE

FIVE SHOTS FIRED AT GOVERNOR

CALCUTTA OUTRAGE

SIR STANLEY JACKSON'S NARROW ESCAPE

GIRL ASSAILANT ARRESTED

A girl graduate of Calcutta University fired five shots from close range at Sir Stanley Jackson, Governor of Bengal, while he was addressing the Convocation of the University on Saturday.

The Governor, who was not injured, owed his escape to his own marvellous coolness and to the fact that the Vice-Chancellor of the University promptly grappled with the assailant.

PROFESSOR WOUNDED

CALCUTTA, Saturday.

Sir Stanley Jackson, Governor of Bengal, better known as the Hon. F. S. Jackson (or "Jacker," the famous Yorkshire and all-England cricket captain), had a narrow escape from death this morning, when five shots were fired at him from close range by

SCOTS' RUGBY DEFEAT

WELSH VICTORY AT MURRAYFIELD

FEW THRILLS IN GRUELLIN[G] CONTEST

The Scottish Rugby XV. gave [a] disappointing display at Murrayfiel[d] on Saturday, and were defeated b[y] Wales by 6 points to nil.

The home team were more ou[t]classed than the score indicates, an[d] at no stage of a desperately hard bu[t] often dull game appeared in a victor[ious] mood.

Edinburgh was invaded by 13,0[00] Welshmen, who added gaiety to th[e] usual international celebration[s] throughout the day.

EDINBURGH INVADE[D]

After the Scottish XV.'s plucky if uni[n]spired display against the Springboks, a[nd] despite changes generally condemned, hop[es] ran high that the home team cou[ld] vanquish the international champio[ns]

পিতা-কন্যার যুগলবন্দীতে রচনা হল ২৫ পাতার এক অসামান্য বিবৃতি। বীনা দাশ ঋজু এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে আদালতে পাঠ করলেন সেই জবানবন্দী। শুরুতেই বললেন,

"I fired on the governor impelled by love for my country, which is repressed. I sought only a way to death by offering myself at my country's feet and thus end my suffering. I invite the attention of all to the situation created by the measures of the government … I can assure you I have no personal feeling against the governor. As a man he is as good as my father, but as governor of Bengal he represents a system which has kept enslaved 300,000,000 men and women of my country...."

বললেন, "..... is life worth living in an India so subjected to wrong, and continually groaning under the tyranny of a foreign Government, or is it not better to make one's supreme protest against it by offering one's life away? Would not the immolation of a daughter of India and of a son of England awaken India to the sin of its acquiescence to its continued state of subjection and England to the iniquities of its proceedings?"

বীনার পুরো বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত আদালতে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। পরের দিনের কাগজে সেই বিবৃতি পড়ে আলোড়িত হল সারা বিশ্ব। কদিন বাদেই ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা চাপালেন বীনা দাশের বিবৃতি প্রকাশের ওপর।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ঘটনার মাত্র ৯ দিনের মধ্যে বিচার সমাপ্ত। ৯ বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়ে গেল বীনা দাশের।

মাত্র একুশ বছর বয়সের একটি মেয়ের এই বৈপ্লবিক ভাবনা চিন্তা, এই ওজস্বিতা কিন্তু একদিনে আসেনি। তার গড়ে ওঠার পথটাই ছিল অন্যরকম। বাবা বেণীমাধব দাশকে রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ছাত্রদের রাজদ্রোহে দীক্ষিত করার অভিযোগে বদলি করা হয়। নেতাজি সুভাষ তাঁর বইয়ে প্রিয় শিক্ষক হিসেবে ওঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন। বীনার মা, সরলা দাশ সহায় সম্বলহীন মহিলাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য গড়ে তোলেন পুন্যাশ্রম। বীনার দিদি কল্যাণীও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে।

১০ বছর বয়সে বীনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসা সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পেলেন ১৬ বছর বয়সে পড়া পথের দাবীর নায়ক সব্যসাচীর মধ্যে। বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ১৯২৬ এ প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পথের দাবী তখন নিষিদ্ধ। স্কুলে প্রিয় উপন্যাস নিয়ে রচনা লিখতে দিলে বীনা লিখলেন, 'পথের দাবী'র কথা। যথারীতি নম্বর কম পেলেন।

কলেজে উঠেই ছাত্রী সংঘে যোগ দিলেন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রদর্শনে সামিল হলেন। ধীরে ধীরে কলকাতার ছাত্রীসমাজে আন্দোলনের মুখ উঠলেন। এইসময় থেকেই যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগাযোগ। গভর্নরকে গুলি করার পরিকল্পনা অবশ্য একান্তই নিজস্ব। রামমোহন লাইব্রেরিতে বীনাকে লুকিয়ে পিস্তল সরবরাহ করেছিলেন বিপ্লবী কমলা দাসগুপ্ত।

১৯৩৯ সালে গান্ধীজির চেষ্টায় কিছু রাজবন্দী মুক্তি পান। তার মধ্যে বীনাও ছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পুরোপুরি ভাবে জড়িয়ে পড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামে।

১৯৪২, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে দেশ উত্তাল। ১৯৪৩ সালে বিক্ষোভ চলাকালীন হাজরা মোড় থেকে গ্রেপ্তার হলেন জেলা কংগ্রেস সম্পাদিকা বীনা দাশ। আবার তিন বছরের কারাবাস।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য ছিলেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে শান্তি ও ত্রাণের কাজে গান্ধীজির সঙ্গী হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কিন্তু এই অগ্নিকন্যার কাজ শেষ হয়ে যায়নি। সমাজসেবা, ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেও প্রবল রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদে মুখর হতেন।

১৯৬০ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য ভাতা উনি কখনো নেননি।

স্বামী, যুগান্তর দলের বিপ্লবী যতীশ চন্দ্র ভৌমিকের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে স্বেচ্ছা অন্তরালে চলে যান। হৃষিকেশের নানা আশ্রমে দিন কাটতে থাকে। ১৯৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, হৃষিকেশের পথে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ পাওয়া যায়। প্রায় একমাসের পুলিশি তদন্তের পরে জানা যায় ৭৫ বছর বয়সী সেই মহিলাই ভারতের অগ্নিকন্যা, স্বাধীনতার লড়াইয়ে সর্বস্বত্যাগী, অসমসাহসিনী বীনা দাশ।

তাঁর এভাবে মৃত্যু, ত্যাগ, গৌরব, সংগ্রামে মহিয়সী এক নারীর দাবীহীন, পরিচয়হীন একটি দেহ সনাক্তকরণের অপেক্ষায়, ভাবলে স্বাধীন ভারতের মানুষ হিসেবে আজও লজ্জিত হই।

সরলা, বীনা, কল্যাণী, কমলাদের মত নারী আজকের সমাজেও প্রয়োজন। তাঁরা আছেনও, তবে তাঁদের সংগ্রাম, ত্যাগ, সাহসের জায়গাটা হয়ত আলাদা। এই উপাখ্যানের মাধ্যমে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই। নারীশক্তির জয় হোক !

প্রমীলা বসু

বিশ্বাস

(লিখন: সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়)

১৯৬৮ সাল, সেবার আমরা লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ থেকে ঠিক করলাম যে আমরা ছাত্রীদের নিয়ে পুজোর আগে এক্সকার্শনে যাব দার্জিলিঙে।

প্রধান উদ্দেশ্য কিছু পাহাড়ি ফার্ণ্ ও অপুষ্পক গাছ সংগ্রহ করা, কারণ আমাদের ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীতের সংখ্যা বড় কমে গিয়েছিল। আমরা গেলাম সবাই মিলে কুড়ি জন। তার মধ্যে আমরা তিনজন অধ্যাপিকা ছিলাম। সেবার আমরা রওনা হয়েছিলাম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। দার্জিলিঙে পৌঁছেও বৃষ্টির শেষ নেই, কিন্তু তারই মধ্যে কত জায়গা ঘুরলাম, কত রকম গাছ সংগ্রহ করলাম তার ঠিক নেই।

শেষের দিকে একদিন ঠিক হলো 'হ্যাপি ভ্যালি' চায়ের বাগানে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন বৃষ্টিও কম ছিল। মেঘমুক্ত আকাশ থাকায় 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র দর্শন পেয়ে মনটা খুব ভালো ছিল। চায়ের বাগানটি শহর থেকে বেশ নীচে অবস্থিত ছিল। তাই বেশ কিছুটা পথ নেমে যেতে হয়। আমরা রওনা হলাম, রাস্তা বড় খারাপ, প্রতিপদে পা সাবধানে ফেলতে হচ্ছে। পথে শুধু আল্‌গা আল্‌গা পাথর ও নুড়ি ছাওয়া। অনেকটা নেমে গিয়েছি সবাই হৈ হৈ করতে করতে, প্রায় চা বাগানের কাছাকাছি এসে গিয়েছি, আর দুই তিনটে বাঁক পেরোলেই চা-বাগানে পৌঁছে যাব। এমন সময় আমার দুই পায়ের জুতোর স্ট্র্যাপ্-ই ছিঁড়ে গেল! তার পরে আর কিছুতেই চলতে পারছি না। অনেক অভিনব পন্থায় স্ট্র্যাপ্ লাগিয়ে চলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনোটাই কাজে দিল না। তখন একটা কাল্‌ভার্ট্-এর উপর আমি বসে পড়লাম ও অন্যান্য বন্ধু দুজনকে বললাম মেয়েদের নিয়ে চা-বাগানের সবকিছু দেখিয়ে আনার জন্য। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে একটি দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে 'মালিনী' রয়ে গেল আমার সঙ্গে। মালিনী ওর বাবার সঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে আর কিছু কিছু চা-বাগানও দেখেছে। আমিও এর আগে দু'বার এরকম বাগান দেখেছি।

আমরা দুজনে কাল্‌ভার্ট্-এ বসে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলাম। ওর খুব চিন্তা আমি কিভাবে খালি পায়ে এই পাহাড়ী রাস্তায় ওপরে উঠে যাব। হঠাৎ মালিনী আমায় জিজ্ঞাসা করল – "Didi do you believe in God?" আমি যখন 'হ্যাঁ' বললাম, তখন ও বললো, "Let us pray to God, because whenever I call Him in danger, He helps me!" ও আমার পাশে বসে আমার দুটো হাত ওর হাতের মধ্যে নিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে নীরবে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিলো। আমিও স্থির থাকতে পারলাম না, মনে মনে বললাম 'ভগবান তুমি কে ? কোথায় আছো ? কিছুই জানি না। তোমার নির্দেশেই সবকিছু করে যাচ্ছি – আজ এই কন্যার বিশ্বাস তুমি ভেঙে দিও না।' দুজনেই প্রার্থনা শেষে প্রণাম জানিয়ে আবার গল্প শুরু করে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর, আমাদের উল্টো দিকের কাল্‌ভার্ট্-এর পাশে যে সরু রাস্তা নেমে গেছে, সেখান দিয়ে দেখি একটি হিন্দুস্থানী মুচি উঠে আসছে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, পরনে একটি হাফ হাতা জামার উপর একটি গরম জামা। তাকে দেখে আমরা যেমন আনন্দিত হলাম, তেমনই আশ্চর্য হলাম – যেখানে কোনও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই সেখানে কিনা মুচি এসে হাজির!! যা হোক, আমরা তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া এগিয়ে দিলাম। সে সামনে বসে বেশ যত্ন করে সারিয়ে দিল। কাজ হয়ে যাবার পর যখন তাকে পয়সা দিতে উদ্যত হলাম, সে তা নিলো না, মিষ্টি করে হেসে আবার যে কাল্‌ভার্ট্-এ বসে ছিলাম তার পাশের সরু রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। মালিনী ও আমি হতবাক হয়ে গেলাম! তারপর মালিনীর কী আনন্দ – রাস্তার ওপরেই লাফালাফি শুরু করে দিলো। বলতে লাগলো "Now see Didi, God is everywhere! If we earnestly call Him, He will come to save us from any danger. That cobbler is no one but God!"

আমার বন্ধুরাও মেয়েদের নিয়ে ফিরে এসে এ ঘটনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এই ঘটনা কার জীবনে কতটুকু রেখাপাত করেছিল বা কে মনে রেখেছিল তা জানিনা। তবে আমার মন থেকে মুছে যায় নি। যখনই চিন্তা করি এই জীবন সায়াহ্নে – অবাক হয়ে যাই – কি করে এমন সম্ভব হলো !!

==========

প্রমীলা বসু – পরিচয় – জন্মঃ ৮ অক্টোবর ১৯১০। চট্টগ্রাম। মৃত্যুঃ ২১ অক্টোবর ১৯৮৯। কলকাতা।

প্রমীলা চট্টগ্রামের সিংহ জমিদার বাড়ির অন্যতম কন্যা। প্রমীলার বাবা জমিদারী ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্ম হ'ন। ইংরেজ আমলে Deputy Magistrate পদে চাকরী করেন। প্রমীলা ৭-৯ বছর বয়সের মধ্যে বাবা-মা-কে হারান। মামাবাড়িতে আশ্রয় হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ২৮ আগস্ট ১৯২৭-এ বিবাহ হয়। স্বামী সুশীলকুমার বসু ছিলেন ১৩ বছরের বড়। সাংসারিক দায়িত্ব ও শ্বশুরবাড়ির কর্তব্য পালন ক'রে চলেন। ১৯৩১ সালে matric পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামী অবাক হলেও, সমর্থন করেন ও শিক্ষক নিযুক্ত করেন। নিজের স্ত্রী-কে বাংলা ও ইংরেজী পড়ালেন। ১৯৩২ – প্রমীলা গণিত-এ compulsory ও additional-এ 'Letter' নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। ১৯৩৪-এ গণিতে Honours নিয়ে BSc পড়তে শুরু করেন। ডাক্তারী পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু, প্রমীলার শ্বাশুড়িমা আপত্তি করায়, তা' স্বপ্নই থেকে যায়। 'Distinction' নিয়ে স্নাতক হ'ন। উদ্ভিদবিদ্যায় Honours নিয়ে Presidency College-এ স্নাতকোত্তর পড়তে চা'ন। কিন্তু সেইসময়ে মহিলাদের, বিশেষত ভারতীয়দের, পক্ষে সম্ভব ছিল না প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া। ১৯৩৮ সালে MSc পাশ করেন। ১৯৩৭/৩৮-এ বালীগঞ্জ Science College-এ অনুষ্ঠিত All India Science Congress অধিবেশনে ছাত্রী হিসাবে বহু গণ্যমান্য বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪৭-এ, নানা প্রতিকূলতা সামলে প্রমীলা Lady Brabourne College-এ উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ইতিমধ্যে, ১৯৩৯-এ জন্মেছেন প্রমীলার প্রথম সন্তান, আমার মা সুনন্দা; ১৯৪২-এ দ্বিতীয় সন্তান, সুচেতা। সংসারকর্মে, প্রমীলার স্বামী ছিলেন সমানাংশে সক্রিয় – রান্না, বাজার, সন্তানপালন, হিসাবপত্র। Bethune College-এও অধ্যাপনা করেছেন প্রমীলা। – নানা ধরণের সেলাই, রান্না, গঙ্গামাটি দিয়ে ভাস্কর্য, ডাকটিকিটের সুবৃহৎ সংগ্রহ, অদম্য সাহস ও পরোপকারিতা, বিজ্ঞান-সচেতনতা, ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা, সাহিত্য ও গল্প পাঠ – এ'গুলি ছিল প্রমীলার অন্যতম বৈশিষ্ট। প্রমীলা ছিলেন এক বস্তুনিষ্ঠ ও সংবেদনশীল চরিত্র, যাঁ'র জীবনটি ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও বাস্তবিকতার এক জটিল মিশ্রণ। বহু ঘটনা ও গভীর অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয় প্রমীলার জীবন।।

শহিদুল ইসলাম

গওহর জানের বৈচিত্র্যময় জীবন

কার গলার মাধ্যমে ভারতবর্ষে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ডে চিরকালের জন্য গান ধরে রাখা এবং দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সেকথা আমরা ভুলেই গেছি। অথচ এটা যে কতবড় আবিষ্কার এবং প্রয়োজনীয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার আগে যাঁরা গান করেছেন, উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের গণ্ডির বাইরে সে গান ও গায়ক নিজেকে ছড়িয়ে দেবার কথা ভাবতেই পারতেন না। শেষ শ্রোতা-দর্শকের মৃত্যুর সাথে সাথে সঙ্গীতকারও বিলুপ্ত হয়ে যেতেন। হয়তো তাঁর নাম ও সঙ্গীতের সুর বংশপরম্পরায় সময়কে অতিক্রম করে শত শত বছর বেঁচে থাকে। যেমনটি আছেন মুঘল সম্রাট আকবরের নবরত্নের একজন তানসেন। কিন্তু তানসেনের নিজের গলার গান শোনার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বহু আগে ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। তানসেনের নিজের গলার গান ধরে রাখার কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না।

গওহরজান নামের কলকাতার একজন বাইজি ১৯০২ সালের ২ সেপ্টেম্বরে তিন মিনিটের একটি রেকর্ডে 'যোগিয়া' রাগে প্রথম গান করে নিজেকে ইতিহাসের পাতায় স্হান করে নিয়েছেন। ৭৮ rpm রেকর্ডটি মেকশিফট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গানটি রেকর্ড করে Gramophone Co. of India কলকাতার Great Eastern হোটেলের দু'টি বড় কক্ষে। লন্ডনের গ্রামোফোন কোম্পানির প্রথম এজেন্ট হিসেবে ১৯০২ সালে এদেশে আসেন ফ্রেডারিক গাইসবার্গ (Gaisberg)। তিনি রেকর্ড করার জন্য শিল্পীর সন্ধান করছিলেন। প্রথমে শশীমুখী ও ফনীবালা নামে দু'জনার গান শোনেন। পছন্দ হয় না। তখন তিনি গওহরজানের সন্ধান পান। জন্ম সূত্রে গওহরজান বাঙালি নন। ১৮৭৩ সালে বেনারসের আজমগড়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা মা তার নাম রাখেন আইলিন এঞ্জেলিনা ইয়োআর্ড। বাবা উইলিয়াম রবার্ট ইয়োআর্ড একজন আরমেনিয়ান। মা জন্মসূত্রে একজন ভারতীয় ভিক্টোরিয়া হেমিংস, সেকালের একজন নামকরা সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পী। ১৮৭২ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। গওহরের ঠাকুরমা ছিলেন হিন্দু ও ঠাকুরদা একজন বৃটিশ। ১৮৭৯ তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে মা মেয়ে বড় কষ্টের মধ্যে পড়েন। এঞ্জেলিনা বয়স তখন ৬। খুরশিদ নামের একজন গান পাগল ভদ্রলোকের সঙ্গে তারা বেনারস চলে যান। মা ভিক্টোরিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজে মালকাজান নাম গ্রহণ করেন এবং মেয়ে এঞ্জেলিনা হন গওহরজান।

বড়ে মালকাজান বেনারসের রাজদরবারের দরবারি গায়কার আসন অলঙ্কৃত করেন। সে সময় আরও তিনজন মালকাজান ছিলেন। আগ্রার মালকাজান, মূলক পুখরাজের মালকাজান ও চুলবুলির মালকাজান। তাই গওহরজানের মায়ের নামের আগে 'বড়ে' শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়।

১৮৮৩ সালে বড়ে মালকাজান বৃটিশ অধিকৃত ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতায় আসেন এবং নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে স্হান লাভ করেন। নবাব তখন থাকতেন মেটিয়াবুরুজে, বর্তমানের গার্ডেন রীচ। তিন বছরের মধ্যেই তিনি ২৪ চিৎপুর রোডে, বর্তমানে রবীন্দ্র সদন, একটি বাড়ি কেনেন ৪০,০০০/- টাকায়। এই বাড়িতেই গওহরজানের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়। গওহর কালে খাঁন (কালু উস্তাদ) ও রামপুরের উস্তাদ উজীর খাঁন এবং পাতিয়ালা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা উস্তাদ আলী বখশের কাছে গানের তালিম নিতে শুরু করেন এবং বিখ্যাত কত্থক নৃত্য শিল্পী বিরজু মহারাজের দাদা বৃন্দাদিন মহারাজের কাছে কত্থক নৃত্য শিখতে শুরু করেন। ধ্রুপদ ধামার শেখেন শিজানবাই, বাংলা কীর্তন চরণ দাসের কাছে। 'হামদান' নামে তিনি গজল লেখেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বহু গানে সুরারোপ করেছেন। গওহরজান জনসম্মুখে প্রথম গান করেন কলকাতার দ্বারভাঙা মহারাজের দরবারে ১৮৮৭ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে। মহারাজা তাঁর গান শুনে এতই মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁকে কোর্ট মিউজিসিয়ান হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত ! তিনি 'ড্যানসিং গার্ল' হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব সুন্দরী।

১৯০৪-৫ সালে গুজরাটি-পারসি নায়ক অমৃত কেসব নায়কের সঙ্গে ভালবাসার জালে জড়িয়ে যান। তার আগেই ১৯০৬ সালে গওহরজান তাঁর মা'কে হারান। গওহরজান কেসবের সঙ্গে বেশ সুখীই ছিলেন। কিন্ত মাত্র অল্প সময়ের জন্য। ১৯০৭ সালের ১৮ জুলাই অমৃত কেসব হঠাৎই নতুন একটি নাটকের রিহার্সালের সময় হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।

১৯১০ সালে গওহর মাদ্রাজে আসেন। ভিক্টোরিয়া পারনিকহকের আমন্ত্রণে। তার গান তামিল ভাষায় রুপান্তরিত হয়। ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের coronation অনুষ্ঠানে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান। পরম এক সৌভাগ্য! দশ হাজার বৃটিশ ও দেশের রাজা মহারাজাদের সামনে তিনি এলাহাবাদের বিখ্যাত গায়িকা জানকি বাই-এর সঙ্গে ডুয়েট গান করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চম জর্জ নিজে হাতে তাঁর হাতে প্রচুর মোহর তুলে দেন। বেগম আখতার প্রথম জীবনে সিনেমায় গাইবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু গওহরজানের গান শুনে সে ইচ্ছা ত্যাগ করে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি মন দেন এবং উস্তাদ ইমদাদ খাঁনের কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। ইমদাদ খাঁন বড়ে মালকাজান ও গওহরজানের সঙ্গে সারেঙ্গী বাজাতেন। শেষ জীবনে গওহরজান মাইহারের রাজা ওয়াদিয়ার-৪ এর দরবারে প্রাসাদ গায়িকা হিসাবে যোগ দেন ১৯২৮ সালের ১ আগস্ট।

জীবনে তাঁকে তিনটি মামলা সামলাতে হয়। ভুগলি নামের একজন কলকাতার সম্পত্তি দেখভাল করতো। সে তাঁর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করে। সে বলে যে গওহরজান জারজ সন্তান। তার বাবা নেই। সে সময়ের নামি আইনজীবীর সাহায্যে গওহরজান মামলা জেতেন। বাবা রবার্টকে খুঁজে বের করতে হয় কলকাতার এক গলি থেকে এবং তাকে আদালতে হাজির করতে হয়। বাবা তাঁকে নিজের মেয়ে বলে সাক্ষী দেন। বাবাও তেমনি – সেজন্য সন্তানের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করেছিলেন। পরে একজন মুসলিম ছেলে তাঁর দেখভাল করতো। তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট। প্রেমভালবাসায় পূর্ণ গওহরজান তাকে ভালবেসেছিলেন। সেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে শেষ জীবনটা তাঁর কষ্টে কেটেছে। ১৯৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি তিনি প্রায় নিঃসঙ্গভাবে মারা যান।

১৯০২-১৯২০ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ৬০০ গান রেকর্ড করেছিলেন দশটি "ভাষায়। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, তামিল, মারাঠি, আরবি, ফরাসি, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজি। প্রতিটি গানের শেষে বলতেন "My Name is Gauharjan." সঙ্গত কারণেই ডিস্কটা চাপ দিয়ে কপি করার জন্য জার্মানির হ্যানোভারে নিয়ে যেতে হত। এতে টেকনিসিয়ানদের সুবিধা হত তাঁকে চিনতে। ঠুমরি, দাদরা, কাজরি, চৈতি, ভজন, তারানার মাধ্যমে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। ৭৮ rpmএর ৩ মিনিটের মধ্যে একটি রাগ গাইবার সাহস তিনিই দেখিয়েছিলেন। মুসলিম হলেও তাঁর গানের বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু মিথোলজি। হরি, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

তিনি সারা বিশ্বে কত জনপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ ভারত ও ইংল্যান্ডের পোস্টকার্ড ও দেশলাইয়ের বাক্সের ওপর গওহরজানের ছবি ছাপা হত। ইন্দুবালা ও অনাথবন্ধু ঘোষ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম।

গওহরজানের খামখেয়ালির সামান্য কিছু তথ্য দিই।

তিনি একটি পোষাক ও গহনা একবারের বেশি পরতেন না। তাই সব সময় তার সঙ্গে থাকতো দু'জন অস্ত্রধারী পাহারাদার।

তাঁর বিড়ালের বাচ্চা হওয়া উপলক্ষে শহরের সব মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছিলেন। খরচ হয়েছিল ২০,০০০/- টাকা যা বর্তমানে ১০ কোটি টাকা। তখন এক ভরি সোনার দাম ছিল ২০/- টাকা। ১৯২০ সাল খেলাফত আন্দোলন চলছে, মহাত্মা গান্ধী গওহরজানের সাহায্য কামনা করেন। তিনি সানন্দে রাজী হন এক শর্তে। মহাত্মা গান্ধীকে অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনতে আসতে হবে। গান্ধীজী রাজী হন কিন্ত কোন কাজে আটকে পড়লে আসতে পারেন নি। তিনি মওলানা শওকত আলীকে পাঠান। অনুষ্ঠানে ২৪,০০০/- হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। গওহরজান

মওলানা সাহেবের হাতে ১২,০০০/- টাকা দিয়ে বলেন, "মহাত্মাজী কথা দিয়েও বাইজীর গান শুনতে আসেন নি। আমিও পুরো কথা রাখলাম না।"

তিনি মাঝেমধ্যেই উধাও হয়ে যেতেন। রেস খেলতে যেতেন মুম্বাই। মধ্য প্রদেশের মহারাজা তাঁকে দরবারে গান পরিবেশন করার আমন্ত্রণ জানান। গওহরজান শর্ত দেন যে তাঁর সঙ্গে ১১১ জন সঙ্গী যাবেন। ১০ জন ধোপা, ১০ জন খানশামা, ৪ জন নাপিত ও ৬টি ঘোড়া। আশ্চর্যের বিষয় মহারাজা তাতেই রাজী হয়েছিলেন। তিনি ৬টি ঘোড়া টানা ফিটন গাড়িতে কলকাতার রাস্তায় চলাচল করতেন। শোনা যায় একদিন গভর্নর রাস্তায় তাঁর গাড়ি দেখে ভেবেছিলেন যে কোন রাজা মহারাজা হবে। তিনি মাথার হ্যাট খুলে সম্মান দেখান। পরে জানতে পারেন যে, না – তিনি একজন বাইজী। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ ধরনের গাড়িতে চড়া আইনসম্মত ছিল না। তিনি তখন গওহরজানকে ১০০০/- টাকা জরিমানা করেন। গওহরজান তা পরিশোধ করেন। পরদিন তিনি আবার সেই গাড়িতেই রাস্তা নেমেছিলেন। আবার তাঁকে ১০০০/- টাকা জরিমানা করা হলে তিনি তা পরিশোধ করেন। এভাবে তিনি বিশ দিন ঐ গাড়ি নিয়ে বের হন। এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা দেন। এমন অনেক কিংবদন্তী গল্প চালু আছে তার নামে।

গওহরজানের সৃজনশীলতার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। আরও অনেক কিছুই লেখার ছিল। আজ এখানেই শেষ করি।

এই লেখাটার সূত্রগুলি উল্লেখ করতে হয়। গুগল, ইউ টিউবে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছি। তদুপরি বাংলা ভাষায় পৌনে দুই ঘন্টার একটি বায়োপিক ছবি তৈরি হয়েছে। অসাধারণ ছবি। সেখানেও অনেক তথ্য পেয়েছি। গান্ধীর বায়োপিক শ্রেষ্ঠ। আমার মনে হয় তারপরই গওহরজান। সবগুলি দেখে মনে হল একই সোর্স থেকে সবগুলির তথ্য নেয়া হয়েছে। সেটি গওহরজানের জীবনী। লিখেছেন Vikram Sampath. বইটির নাম "My Name is Gauharjan": The Life of a Musician, Rupa & Co. পৃষ্ঠা-৩১৮, মূল্য-৫৯৫/ যদি গওহরজানের ওপর কারো কাছে কোন তথ্য, বই বা প্রবন্ধ থাকে আমাকে সাহায্য করলে আনন্দ পাব; খুশি হব।

স্মৃতিচারণ

জয়ন্তী করঞ্জয়

আমার দেখা রমা দাশগুপ্তা

আজকের সুচিত্রা সেনের কথা লিখতে বসে সেই ছেচল্লিশ সাত-চল্লিশের দিন গুলোই বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর সেই দীপ্ত গ্রীবাভঙ্গি নয়ন-লোভন রূপ আর সদর্প পদক্ষেপ যা আমি আর স্কুল ছাড়বার পর কখনোই কারও মধ্যে দেখতে পাইনি।

পাবনা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে আমি উনিশশো ছেচল্লিশের জানুয়ারীতে ভর্ত্তি হলাম। তার আগে আমি আমার বাবার কাছে পড়ে প্রতি বছর হাইস্কুলের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ক্লাসে উঠেছি। কারণ বাবা পাবনা উচ্চ বিদ্যালয়ের (ছেলেদের) প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্কুলে পাঠাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও তিনি নিজে শিক্ষাকতা করেছেন সারাজীবন তবুও নিজের সন্তানদের নিজের হাতে রেখে পড়ানোতে বিশ্বাসী ছিলেন।

যাইহোক সেই যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। আমি যখন প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হলাম তখন সুচিত্রা সেন, আমার রমাদি ওরফে কৃষ্ণা দাশগুপ্তা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, আমার এক ক্লাস উচুঁতে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। আরও অনেক মেয়ের মধ্যে এক পলকেই দেখে মুগ্ধ হবার ব্যক্তিত্ব কোটিতে একজনেরই হয়। তাঁর অপূর্ব সুন্দর কণ্ঠস্বর শুধু আমাদের নয় সমস্ত ছাত্রীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। ঐ স্কুলের সময়টুকুর মধ্যে রমাদির ইংরাজী কবিতা আবৃত্তির স্টাইল এবং উচ্চারণের বিশুদ্ধতা দেখে শুনে ঐ বয়েসেই মনে হত যেন কোন মন্ত্রবলে এক বিদেশিনী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তখন বৃটিশ আমলের শেষ এবং আমরা সবে স্বাধীনতা পেয়েছি। রেশটা কাটেনি তখনও অনুকরণ প্রিয়তার। কথায় কথায় ইংরাজী বাক্য ব্যবহার করা এবং ওদের ভাষা রপ্ত করবার প্রবণতা থেকে সাধারণ বাঙালী সম্প্রদায় তখনও নিজেদের সরিয়ে আনতে পারেনি। তাই অল্পদিনেই আমরা স্কুলের সব মেয়েরা ওঁর রূপ ও গুণ মুগ্ধ ভক্ত হয়ে গেলাম।

ছোটোবেলা থেকেই আমার গানের গলা নাকি খুব সুন্দর ছিল, সকলেই ডেকে নিয়ে গান শুনতো, আর সঙ্গীতানুরাগ ছিল আমার রক্তে। আমার ঠাকুরদা এবং বাবা পরে দাদারা সকলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা করতেন এবং গানের জগতে তাঁদের অবাধ বিচরণ ছিল। সেই সুবাদে আমিও একটু আধটু যা গাইতাম, তাতেই আমি কৃষ্ণাদির খুব কাছের প্রিয় একজন মানুষ হয়ে গেলাম। কখনও কখনও নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েও আমার গান শুনতেন। ওঁর বোন হেনা আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো, সেই সুবাদে ওঁদের বাড়ীতে যাওয়া আসা ছিল আমার। নিজের ছোটবোনের মতই ভালবাসতেন। যখন তখন ক্লাসের ফাঁক থাকলেই উনি আমাকে ওঁর ক্লাসে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গান শুনতেন। ছোট থেকে আমি হারমনিয়াম বাজিয়ে গাইতে পারি বলে স্কুলের যে কোনও অনুষ্ঠানে আমার ডাক পড়তো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য অভিনীত হবে, সবার আগে ডাক আসতো কৃষ্ণা আর জয়ন্তীর - একজন গাইবে আর একজন নাচবে। 'পূজারিনী', 'অভিসার' কত গীতিনাটিকায় যে আমাদের মিলিত নাচগান ছিল, সেদিনের পাবনা গার্লস হাইস্কুল তার সাক্ষী। বড়দিদি অমিয়াদির কড়া আদেশ ছিল আমরা দুজন ছাড়া কোন উৎসব হবেনা। আজ ভাবি সেই কৃষ্ণাদি-

কে আর আজকের মহানায়িকা সুচিত্রা সেন-কে যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন করলেন নিজের যোগ্যতায় ও রাজকীয় মর্য্যাদায়। আমি এক সাধারণ গৃহবধু হয়ে আরও লক্ষ লক্ষ নমুনার একজন হয়ে এখনও বেঁচে আছি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারলাম না। আসলে কৃষ্ণাদির সঙ্গে আমার তফাৎ — যে তেজ ও গরিমার অধিকারিণী তিনি ছিলেন, আমার মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছিল না। ঐ স্কুলে পড়াকালীনই ওঁর পিসী যিনি আমাদের স্কুলের একজন টিচার ওঁকে নিয়ে গেলেন বোলপুর বিশ্বভারতীতে ভর্ত্তি করবেন বলে। অত রূপ ও গুণের আধার তাঁকে কেন ধরে রাখতে পারবে ঐ ছোট্ট মফস্বল শহর পাবনা। তারপর কিছুদিনের মধ্যে শুনলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে কলকাতার এক বিরাট শিল্পপতির ছেলের সঙ্গে ওখানেই ইতি আমাদের অসমবয়সী কৈশোরের বন্ধুত্বের।

কিন্তু আমি ওকে কখনোই ভুলে যাইনি। খুব মনে পড়ে ওঁর সেই সুরেলা মধুর কণ্ঠস্বর আর যাদুকরা বাচন ভঙ্গি আর ইষৎ বঙ্কিম পদক্ষেপ। দেহ সৌষ্টবে যেন বিদ্যুৎ হিল্লোলিত হত ওঁর প্রতিটি ভঙ্গিমায়। একটি ইংরাজী কবিতা আমাদের পাঠ্য ছিল আজ কবির নামটা মনে নেই। তার বিষয় বস্তু ছিল এই যে একজন সুঁচের কাজ করা দর্জির আত্মবিলাপ, অভাবের জন্য তাকে সুচীশিল্প বেছে নিতে হয়েছে কারণ সেই সেলাইটা পরদিন জমা দিয়ে সে যে পারিশ্রমিক পাবে তা দিয়ে সে তার ছেলের মুখে রুটির টুকরো তুলে দিতে পারবে আর ঐ ছোট মুখে হাসি দেখে তার পেট ও মন ভরে যাবে। ঐ কিশোর বয়েসে সে কবিতার যথার্থ বোঝার সাধ্য না থাকলেও রমাদির আবৃত্তি অভিব্যক্তি ও ছন্দবৈচিত্র্য কোথায় যে গিয়ে ঘা দিত, কোন মনিকোঠার গোপন তন্ত্রীকে আঘাত করতো তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই। কিন্তু খুব ভাল লাগতো। সবার ওপরে ওঁর অপূর্ব বলবার ভঙ্গি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই একজন অন্য দশজনের থেকে অনেক বিশিষ্ট। একেবারে আলাদা।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল, আমরা কলকাতায় চলে এলাম। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, এসে কালিঘাট দেশবন্ধু স্কুলে দু বছর পড়ে শেষে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম। আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হলাম, ইন্টার মিডিয়েট শেষ করার ছমাসের মধ্যে বিয়ে ঠিক করে মা বিয়ে দিলেন। ওখানেই হয়ে গেল আমার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতি। আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হল। কোথায় গেল সেই দিনগুলি রমা দাশগুপ্তার সঙ্গে অভিনয়, নাচ গান রাবিন্দ্রিক পরিবেশের বড় হওয়া আর পড়াশুনা। সংসার নামক যন্ত্রের আবর্তে সমান ভাবে ঘুরে চললাম, জীবনের প্রস্ফুটিত সুবর্ণক্ষণ বয়ে গেল অবহেলায়। আমার আদর্শ বন্ধু কৃষ্ণাদি পেলো জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান যা আমি তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্তের সাথে দূর থেকে আনন্দে উপভোগ করলাম, কাছে যাওয়ার সুযোগ হোলনা।

আজ এতদিন পরে জীবনের সায়াহ্নে এসে ওঁর মৃত্যু আমার মনে জোর আঘাত দিয়ে গেল, যা প্রিয়জন হারাবার বেদনা। আমি তো এখনও অনেক গান গাই, অন্তরে অন্তরে সুর সাধনা করি নিরন্তর। সুরের একনিষ্ঠ পূজারী আমি। বহুদুর থেকে ভেসে আসা কোন সুর কানের ভেতর দিয়ে অন্তর স্পর্শ করে কোন অদৃশ্য তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে জাগিয়ে তোলে।

কৃষ্ণাদিও তো তেমনই ছিলেন, তিনি যে আমায় কি নজরে দেখেছিলেন তা জানিনা, তবে ঐ দুটো বছরের স্মৃতি যেন আমার অন্তরে গাঁথা রয়ে গেছে। জীবনে এমন ভালবাসা আর কখনও পাইনি। ওঁর অত্যন্ত অনুগত ভক্ত ছিলাম আমি। তাঁকে যেন পূজা করতাম দেবী মনে করে। তখন উঠতি কৈশোর, ভাললাগার কথাটা একটু অন্য স্বাদে ভরা, সেই কবির ভাষায়, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'। আজও উত্তম-সুচিত্রার পুরানো সিনেমার দৃশ্য দেখতে বসলে সেই সেদিনের ছবিটাই চোখের ওপর ভেসে ওঠে আর কৃষ্ণাদির সেই আবৃত্তি মুখর চেহারা ''stich, stich stich, until the waist is not bent ….'' আবৃত্তির মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর আজও যেন শুনতে পাই, কানে যেন রিম রিম করে বাজে।

যে রাজকীয় সমারোহে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হল গোটা ভারতবর্ষ অভিভূত হয়ে দেখলো সে দৃশ্য। কজনের ভাগ্যে এমন পরিণতি ঘটে কবির ভাষায় 'মরণ রে তুই মম শ্যাম সমান' তাঁর অবদান সর্বকালে সর্বজনের কাছে চিরন্তন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে আজকের মতো ইতি টানলাম আমার পরম বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ প্রদর্শিকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের বহুমূখী প্রতিভাময় জীবন দর্শনের।

Through many chores we actively live a day, then seek comfort in the shadows of dimming lights of a night sky. Routinely we cross this bridge to reach our sleep, waking up yet again to another day that a tomorrow brings.

I'm ever optimistic, about the potential of promises that a tomorrow holds.

I believe that a new day will begin erasing discrimination, and will be based only on the solid foundation of respect and kindness.

Hand in hand, walking across the bridge, embracing the twilight remnants of an evening sky, we will reach home.

Tomorrow will be another day.

Happy Women's Day, all.

"I Rise I Rise I Rise"

Suparna Chatterjee

I was brought up to believe that being a girl is a blessing of wealth in a family, that in worshipping Ma Durga the deity with ten hands overpowering evil, rightfully earns a woman respect. I was taught to be loyal to friends, make an honest attempt for living, refuse bribes and lies, contribute to the society willingly, remain polite.

My commandments to follow was a long and tiring list.

Readers may well have guessed my age by now.

And I can also sense Gen X's enjoyment, the silent chuckle in relishing aged memory of those unused rusting keys quietly held in our foggy brain as remnant of childhood values. They were keys to a Utopian world that we wished to inherit. As descendants of Baby Boomers who fought for freedom and social change, also known for their reckless valour, carelessness, we believed to have learnt our lessons and we were destined to be better humans.

Yet as days of my lived life watches the Sun setting in the Western horizon, I suffer with others for the loss of our fundamental belief, that the world continue to remain fragmented by narrow domestic walls, religious prejudices and our heads remain bowed in fear.

Let me begin by sharing my own journey of being born in a country with a diverse culture, numerous languages, and a society caught in the clasp of its traditional Indian values and a post-modern discourse of the early seventies. Access to education was by exception only. I was fortunate to have parents who extended this as an opportunity, and I took it by its horns.

At the time, expectations of the society impacted an individual's thoughts and beliefs, ensuring parents guidance on the key behavioural pattern that is to be displayed by children and regarded as acceptable both socially and culturally. Along with all the potential benefits of education, I also felt an urge to push boundaries. And a direct outcome was, I excelled in public speaking, debating, ultimately gravitating towards student politics. Likely, my parents did not see it coming, however, discovering my engagement with politics, a certainty of bad was quickly determined for my unforeseeable future.

My behaviour was indicating non-alignment to societal expectations. I suspect, that as a remedial measure, arranged marriage was imposed on me at an early age. I was promptly shifted to Perth on a dripping wet day in July 1992.

Migrating from my country, my home, my language, my culture, and a world of familiarity to a brand-new place, my perspective suddenly changed. From a confident self-assuring woman, I felt reduced, powerless, vulnerable, and displaced.

Undoubtedly to survive, I progressed with an analysis of my strengths. Based on the successful completion of under graduation and honours in English Literature, I identified this as a responsive capital. On the contrary, my weaknesses were far too many, predominant among these were:

- culturally valued passivity, a philosophical view of causality arising from the Hindu belief in the laws of Karma.

- show of respect for power, a century-old colonial vestige inherited through a genetic composition of my ancestors.
- unable to make independent decisions, the outcome of helicopter parenting, endemic within Indian parents.
- passion carried with a deep sense of guilt, a conviction that it is forbidden for female gender; and
- incapable to undertake household chores, from continued use of domestic help.

As is dominant in animal kingdom, survival instincts kicked in, and faced with a choice to sink or to swim, I learnt to swim and empower myself in the process.

After exhausting my anger and frustration, the raging tempest calmed down, finding solace in things happening for a reason, I became more determined and wanted to equip myself to deal with the new order.

Multicultural face of Australia at the time, was still in making and my heavily accented Indian English mildly frustrated my audience.

An important development point for me was to identify and examine my pronunciation and to closely observe others around me. I started watching available mid-day shows and television series. Very soon, All Saints, The Gennie from Down Under, Healthy Wealthy and Wise, Huey's Cooking Adventures, Neighbours, and Burke's Backyard, not only improved my speaking skills but got me hooked on to these ever-evolving mega-series, feeding to the thirst to know 'what happens next.

Life itself is a journey, and we deal with our fear and empower us in our own ways, as fear only limits us. There is a range of suffering that we have faced, while some are significant others maybe small, yet we have continued. There have been those moments of self-doubts and yet we moved, breaking down barriers, removing speculation, suspicion, mistrust, and conspiracy, that often brews in the dark alley of our own mind.

There is a feeling of being left stunned, as we come across injustice, discrimination, and violence, but we continue to emerge as a force to reckon with and we rise.

Let us rise, not as the deity to be seen with ten hands to be prayed but as the fearless Warrior Princess Chitrangada, to be standing tall and as the trusted partner both in good times and bad, not expecting to be protected rather to fight every war as an equal, walk in stride to meet life as it unfolds.

“I Rise, I Rise, I Rise”.

অনিতা মুখোপাধ্যায়

মা

বাড়ী বাড়ী ঘুরে চিঠি বিলি করাই রামলোচনের কাজ। দীর্ঘদিন এই কাজ করে চলেছে সে। এখন বয়স হয়েছে। তাই কোন পাড়ায় কোন বাড়ী, কোন বাড়ীতে কোন নামে চিঠি আসে সেটা তার জানাই হয়ে গেছে। নতুন নতুন ভাড়াটে এলে অবশ্য অসুবিধায় পড়তে হয়। দুপুরে যখন সে চিঠি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে সব বাড়ীর দরজাই প্রায় তখন বন্ধ থাকে — নাম দেখে চিঠি দেওয়া, তাই মানুষটা যে কে তা সে জানতেই পারে না।

অনেক সময় ইচ্ছে হয় একবার দেখতে নামের মালিককে। যাদের নামে বেশী চিঠি আসে তাদের দেখার তাগিদ রামলোচনের তত বেশী নেই। কিন্তু মাঝে মধ্যে রঙীন খামে মিষ্টিমধুর গন্ধ মাখা কোন মেয়ের নামে যদি চিঠি আসে এই বয়সেও তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। নিজের যৌবনের দিনগুলো উঁকি মারতে থাকে নিজের ভিতরে।

তখনকার দিনে মেয়েদের অনেক ঝামেলা ছিল। বাইরে বেশী বেরোতে পারত না — বেরোলেও পাহারাদার একজন থাকবেই। মেলা মেশায় বিশেষ সুযোগ ছিল না। কাজেই এই রকম চিঠি চট করে একটা আসত না।

তার নিজের জীবনেও মেয়ে বলতে খালি উমাশশী। মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে। সংসার, রান্না খাওয়া, স্বামী শাশুড়ীর সেবা করা — এই সবই তার জীবনের লক্ষ্য ছিল। রোমান্স বা অনুরাগের ছোঁয়ার স্পর্শ ছিল না সেখানে। রামলোচন নিজেও অতশত বুঝতো না।

গ্রামের সহজ সরল ছেলে — তাই অতি সাধারণ ভাবেই তার জীবন কেটেছে।

লেখাপড়া পাঠ চুকিয়ে জীবন যুদ্ধে লেগে পড়েছে। সংসারে মায়ের কথাই সব, তাই মা যেমন বলতেন সে ভাবেই জীবন কাটিয়েছে সে।

বিয়ে করার হুকুম হয়েছে, তো বিয়ে হয়ে গেছে। কলকাতায় এসে পোস্ট অফিসে এই পিওনের চাকুরীটা করতে করতে এখন অনেক কিছু শিখেছে সে।

এখন বয়স হয়ে চারিদিকে দেখেশুনে প্রেমের অর্থ বুঝতে শিখেছে। তাই মুখে মৃদু হাসি নিয়ে রঙীন চিঠি বিলি করে বেড়াচ্ছে।

আজ দুদিন ধরে রামলোচনের চিন্তার শেষ নেই। একটা চিঠি তাকে উদভ্রান্ত করে রেখেছে। 'হালদার বাবু রোড' নামে কোন রাস্তা সে এত বয়সেও শোনেনি। নন্দদুলাল রায়-এর নামে একটা চিঠি, ৫ নম্বর হালদার বাবু রোড — এই ঠিকানায় এসেছে। মেয়েদের কাঁচা হাতের লেখা।

কিন্তু এই নামের রাস্তার কোন সন্ধান নেই রামলোচনের কাছে। সে আগেকার দিনের মানুষ। তাই অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ। এই চিঠিটা যে লিখেছে এবং এটা যার পাওয়ার কথা তাদের প্রতি তার তো একটা কর্তব্য আছে। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছনোই তার কাজ। এই কাজে গাফিলতি সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

মহাচিন্তায় দিন কাটছে তার। নন্দদুলাল রায়কে সে খুঁজে বার করবেই। জানে না কে এই চিঠি লিখেছে যদি খুব দরকারী হয়। চিঠিটা সে আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে। পোষ্টমাষ্টারবাবুর কাছে রাস্তাটার নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল। এই নামের রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পোষ্টমাষ্টারবাবু চিঠিটার ভার তার হাতেই দিয়ে দিয়েছেন।

অনেক খোঁজাখুজির পরেও বিফল মনোরথ হয়ে রামলোচন চিঠিটা যত্ন করে তুলে রাখে। রোজই রাস্তায় ঘোরার সময় মনটা খচখচ করে। নানান লোকের খবর নেয়। কিন্তু কোন লাভ হয় না। এইভাবেই প্রায় একমাস কেটে যায়।

আবার একদিন তার চিঠির থলি থেকে কাঁচা হাতের ঠিকানা লেখা নন্দদুলাল রায়-এর নামে একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে।

চিঠিটা হাতে পেয়ে রামলোচন ধপাস করে বসে পড়ে। হায় হায় কি যে হবে। জানি না কাদের সঙ্গে ভগবান এই খেলাটা খেলছেন — রামলোচন মধ্যে থেকে দোষী হয়ে পড়ছে। ভাবতেও খারাপ লাগছে তার। কি হবে কে জানে।

একদিন বসে ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। যত্ন করে রাখা চিঠি দুখানা বার করে প্রথম চিঠিখানার খাম খুলে দেখে। চিঠিটা এইভাবে লেখা —

বাবা নন্দ,

আজ পাঁচবছর তোমার কোন চিঠি বা খবর পাইনি। তোমার এই দুখিনি মাকে এই ভাবে কি করে ভুলে গেলে বাবা ? আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

নিতান্ত অসহায় হয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। এতদিন ধান ভেঙ্গে, নাড়ু তৈরী করে গ্রামের অন্যের বাড়ীতে নানা রকম কাজ করে নিজের খরচ চালাচ্ছিলাম।

কিন্তু শরীর এখন এতই দুর্বল ও খারাপ হয়ে পড়েছে যে আর কোথাও কাজ করার ক্ষমতা নেই। বাবা আমার বড়ই বিপদ। মাসে অন্ততঃ একশো টাকা না পাঠালে আমার ভাত জুটবে না। যদি এত টাকা না পার কিছু কম পাঠিও। তাতেও আমি একবেলা ফ্যানভাত খেয়ে চালিয়ে নেব।

কলকাতা গিয়ে টাকা রোজগার করে পাঠাবে বলে কথা দিয়েছিলে। মায়ের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখ বাবা।

আশাকরি ভাল আছ। পাড়ার রমাবৌমাকে দিয়ে এই চিঠি লেখালুম।

আশীর্বাদ জেনো

আশীর্বাদিকা মা

চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রামলোচন। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। ওঃ কি নির্মম ? এমন ছেলেও আছে ! নিজের মাকে কেউ এত কষ্ট দিতে পারে ভাবতেও পারে না রামলোচন। কোন এক দুখিনিমা সামান্য কটা টাকার জন্য ছেলের কাছে এইভাবে লিখেছেন। কলকাতায় এসে টাকা রোজগার করে মাকে পাঠায়নি ভাবতেও মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। নিজে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তখনই দ্বিতীয় চিঠির খামটা খুলে দেখে। এই চিঠিতেও না জানি আর কি লেখা আছে। আগের চিঠির উত্তর বা টাকা না পেয়েই নিশ্চয় কিছু লেখা হয়েছে। এক্ষুণি সেটা জানার জন্য চিঠিটা খুলে পড়াও শুরু করে —

বাবা নন্দ,

তোমার কাছে লেখা আগের চিঠির কোনো জবাব পাই নি — কোনো টাকাও তুমি পাঠাও নি।

বড়ই বিপদে পড়ে আবার তোমাকে এই চিঠি লিখছি। এটা জেনো, টাকা না পেয়ে আর কিছুতেই চলবে না। নিদেন পঞ্চাশটা টাকা তুমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও। বেশী টাকা আমার চাই না। এটুকু টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দাও। আমি তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে চাই না বলেই এতদিন কিছু চাই নি। নেহাৎ নিরুপায় হয়ে এই চিঠি লিখছি।

আশীর্বাদ জেনো

তোমার দুখিনি মা

চিঠিটা পড়ে রামলোচন বাক্যহারা হয়ে পড়ে। চোখে জল এসে যায়। রাগে দুঃখে অদেখা নন্দলালকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। ছিঃ ছিঃ নিজের মাকে এত কষ্ট কেউ দেয় কি করে।

বাকী রাতটুকু না ঘুমিয়েই কেটে যায়। সকাল হতেই পোষ্ট অফিসে ছোটে রামলোচন। চিঠির ভেতরে লেখা গ্রামের নামটা পেয়ে পোষ্ট অফিস থেকে সেই গ্রামের পোষ্ট অফিসের সব খবর সংগ্রহ করে সে।

ওপরে নন্দদুলাল রায়-এর মা লিখে নিজের পকেট থেকে দেড়শত টাকা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়। নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে নিজেকে নন্দদুলালের বন্ধুর পরিচয় দেয় সে।

সেই দুখিনি মায়ের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মায়ের মুখখানা খালি মনে পড়ে যাচ্ছে তার আর দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

দিন পনেরো পর সেই কাঁচা হাতের লেখা একটি চিঠি তার ঠিকানায় আসে। না দেখা বউটি লিখেছেন, যেদিন রামলোচনের পাঠানো টাকাটা গ্রামে পৌঁছয় সেইদিনই ওই দুখিনি মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গ্রামের লোকেরা তার পাঠানো টাকায় তাঁর শবদাহ ও শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাই তাড়াতাড়ি টাকা পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

চিঠি পড়ে রামলোচনের চোখদুটি জলে ভরে যায়। না দেখা মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় সে। ভগবান তার মাথায় এই বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন তাই তাঁকেও প্রণাম জানায়।

মনীষা বসু

আমার মা

আমার মা'র নাম ছিল প্রতিমা। মা'র রূপও ছিল প্রতিমার মতো। পাশের বাড়ির জেঠিমার কাছে শুনেছি নতুন বিয়ে হয়ে আসার পর মা'র রূপের খ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে ছিল যে আশেপাশের গ্রাম থেকে বৌ-ঝিরা দল বেঁধে আসতো মাকে দেখতে। আমাদের বাড়িতে কাজ করতো নমিতা মাসির কাছে ছোটবেলায় শুনেছি মা'র নাকি পিঠ ছাপানো একরাশ হাঁটু অবধি কোঁকড়ানো চুল ছিলো। এত চুল ছিল যে মা নিজে নিজের মাথা ঘষতে পারতো না। তখন তো আজকালকার মতো এতো ভালো শ্যাম্পু আর কন্ডিশানর ছিল না। সাবান বা রিঠা দিয়ে চুল ধোয়ার প্রচলন ছিল। সপ্তাহে একদিন একটি মেয়ে এসে মাকে রিঠা দিয়ে চুল ধুয়ে দিত। চুল শুকাবার পর মেয়েটি তেল লাগিয়ে চুলের জট ছাড়িয়ে মাকে নানা রকম খোঁপা বেঁধে দিত। সেই সব খোঁপার সুন্দর সুন্দর নাম ছিল। যেমন শঙ্খচুড়, খেজুরছড়ি, প্রজাপতি ইত্যাদি। গল্প শুনেছি মায়ের এই রূপ দেখেই বাবা মুগ্ধ হয়ে মা'কে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ঢাকায় আমার বড় মাসির বাড়িতে মা বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে আমার বাবা মাকে দেখে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। বাবা আর বড় মেশো ছিল বন্ধু। মা'র সেই অল্প বয়েসের রূপ আমি দেখিনি। আমরা ছ'ভাই বোনের মধ্যে আমি সবার ছোটো। তাই আমার যখন বুঝতে শেখার বয়েস হয়েছে তখন মা'র বোধহয় বছর চল্লিশেক বয়েস হবে। কিন্তু তখনো মাকে দেখতে খুবই সুন্দর লাগতো। মনে আছে স্নানের পর মা যখন সিঁদুর পরে খোলা চুলে ঠাকুর প্রণাম করতো, ছোট্ট আমি মুগ্ধ হয়ে মাকে দেখতাম। ওই সিঁদুর, গায়ে দেবার পাউডার আর শীতের সময় পন্ডসের কোল্ড ক্রিম ছাড়া মাকে অন্য কোন প্রসাধন কোনদিন ব্যবহার করতে দেখিনি।

মা'র আসল জন্ম দিন কবে সেটা না জানার দুঃখ মাকে সারাজীবন কষ্ট দিয়েছে। মা'র কাছে শুনেছি খুব ঝড় বাদলের দিনে মা'র জন্ম হয়েছিল। মা'র জন্মের পর আমার দিদিমার এতটাই শরীর খারাপ হয়েছিল যে শিশু-মা'কে মায়েদের নায়েবের বৌ ওদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ওর ছোট বাচ্চার সাথে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মা'কে বড় করেছিল। প্রায় মাস ছয়েক মা নায়েবের বৌ'র কাছে ছিল। আর এই সব নানা গোলমালে মা'র আসল জন্ম দিনটা কারো মনে ছিল না। দুঃখ করে মাকে অনেকবার বলতে শুনেছি, "আমি তো বানের জলে ভেসে এসেছি"।

মা'র আর একটা দুঃখ ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে না পারার জন্য। মা'র যখন বিয়ে হয় তখন মা ক্লাস টেনে পড়ত। মা বেশ ভালো ছাত্রী ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগে মা বিয়ে করতে চায়নি। বিয়ের প্রস্তাব আসার পরে আমার দাদু আর দিদিমা মাকে বলেছিলেন ওঁরা আমার বাবাকে বলেছেন মা'র খুব ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়ার ইচ্ছে। তাই বিয়ের পর মা যেন পড়াশুনাটা চালিয়ে যেতে পারে। আমার বাবারও তাতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে মায়ের সে ইচ্ছে পূরণ হতে পারেনি। বিয়ের পর খুব তাড়াতাড়ি দাদামণির মানে আমার বড়দার জন্ম হওয়াতে মা'র আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। মা কিন্তু পড়াশুনা ছাড়েনি কখনো। আমি ছোটবেলায় দেখেছি মাকে বই খাতা নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পড়াশুনো করতে। কিন্তু আমাদের ভাই-বোনেদের মানুষ করতে গিয়ে মা আর স্কুল কলেজের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেনি। যদিও স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ হয়নি মা'র, কিন্তু মাকে দেখেছি সব সময় নানা রকম বই পড়তে। সেই অর্থে মা ছিল সত্যিকারের শিক্ষিতা।

পনেরো বছর বয়েসে মা'র বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের তিন চার বছর পরে বাবা ঢাকা থেকে স্যার আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়া গ্রামে আসে। তখন কানুনগোপাড়া ছিল একেবারে অজ পাড়াগাঁ। চারদিকে শুধু ধানের ক্ষেত। অন্ধকার হলেই শেয়ালের হুক্কা হুঁয়া ডাক শুরু হয়ে যেত। মা'র এত ভয় করতো যে সন্ধ্যাবেলা কাজের

মেয়েটা বাড়ি যাওয়ার আগে ওকে দিয়ে রাতের খাবার শোয়ার ঘরে এনে রাখতো। যাতে আর বাইরে যেতে না হয়। খাওয়ার সময় স্টোভে গরম করে নিত। তখনকার দিনে রান্না ঘর একটু দূরে থাকতো। স্যার আশুতোষ কলেজের তখন সবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই বাবাকে নানা রকম এডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে অনেক রাত অবধি কলেজে থাকতে হতো। একা মা দরজা বন্ধ করে দাদামণিকে নিয়ে ঘরে বসে থাকত। দাদামণির তখন বছর তিনেক বয়েস। খুব কথা বলতো। দাদামনির কথা বাইরে থেকে যদি কেও শুনে ফেলে আর মা একা আছে বুঝতে পারে ভেবে মা ভয় পেয়ে দাদামনিকে চুপ করাতে চাইতো নানা রকম খেলনা দিয়ে। কিন্তু ভবী ভুলবার না। দাদামনি না ঘুমানো অবধি সমানে কথা বলে যেত। আর মা বাবা বাড়ি না আসা অবধি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো।

আমার মা'র বাইরেটা যেমন সুন্দর ছিল মা'র অন্তরটিও ছিল তেমনি সুন্দর। মুখে সব সময় একটি মিষ্টি হাসি থাকত। মাকে কখনো কারো সাথে রুক্ষ ব্যবহার করতে দেখিনি। আমাদেরও কখনো সেভাবে বকাবকি করতো না মা। তবে আমার একটা খারাপ অভ্যাস ছিল যার জন্য মা'র কাছে অনেক সময় বকা খেয়েছি। ব্যাপারটা হলো আমি একদম শুকনো রুটি খেতে পারতাম না। আমার পছন্দ ছিল লুচি, পরোটা বা অন্ততঃপক্ষ্যে ঘি দিয়ে ভাজা রুটি। তাই ছুটির দিনে জলখাবারে কোনদিন যদি শুকনো রুটি তরকারি হতো তাহলে আমি তরকারিটা খেয়ে রুটি বিছানার তোষকের নিচে লুকিয়ে রাখতাম। তার ফলে বিছানায় পিঁপড়ে এসে যেত। আর বিছানায় পিঁপড়ে দেখলেই মা'র বুঝতে অসুবিধা হতো না এটা কার কাজ। তখন আর মা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারতো না।

মা'র কথা লিখতে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছে। একটা কথা না বললেই নয়। মা'র রান্নার হাত খুব ভালো ছিল। মা'র রান্না ডিমের ডালনা, দই মাছ, ইলিশ ভাপা, বেগুন চচ্চড়ি ইত্যাদির স্বাদ এখনো যেন মুখে লেগে আছে। মা'র হাতের কেক, পুডিং, লবঙ্গ লতিকা, গাজরের হালুয়ার কথা আমার বন্ধুরা এখনো বলে। আমি কোনদিন খুব একটা মিষ্টির ভক্ত ছিলাম না। তবে আমার ভালো লাগতো মা'র বানানো লেডিকেনি। এছাড়া মায়ের তৈরী ফুলকপির সিঙ্গারা, কুচো নিমকি আর মাছের চপের স্বাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

চট্টগ্রামে খুব সাইক্লোন হতো। একবারের কথা মনে আছে। সেবার খুব বড় সাইক্লোন হয়েছিল আর তারপর বন্যা। তখন আমি খুব ছোট। চট্টগ্রামের বেশির ভাগ বাড়ি, বিশেষ করে গরিবদের বাড়িগুলো ছিল মাটির দেওয়াল আর শনের ছাদ দিয়ে বানানো। সাইক্লনে বাড়ি ভেঙে ছাদ উড়ে গিয়ে সে এক বিরাট দুর্যোগ। তখন অনেক পরিবার এসে আমাদের বাড়িতে ছিল। সেই সময় দেখেছি বড় বড় কড়াইতে মাকে সবার জন্য খিচুড়ি আর লাবড়ার তরকারি রাঁধতে। সবাইকে দেখতাম খুব তৃপ্তি করে খেতে। আমরাও তাই খেতাম। আমরা বায়না করে অন্য কিছু চাইলে মা বলতো, "সবাই যা খাচ্ছে তোমাদেরও তাই খেতে হবে। তোমরা খাবে আর ওরা খাবে না তা তো হয়না। আমি যখন সবাই কে দিতে পারছিনা তখন শুধু তোমাদের কি করে দেব ?" তখন রাগ হতো কিন্তু এখন বুঝতে পারি মা'র মন কত বড় ছিল।

আজকাল যখন দেখি ধর্ম নিয়ে এত মাতামাতি, যখন দেখি তাবড় তাবড় তথাকথিত শিক্ষিতরা ধর্ম নিয়ে লড়াই করছে। সমগ্র বিশ্ব যখন ধর্ম নিয়ে হিংসায় উন্মত্ত, তখন আমার মা'র কথা মনে পড়ে যায়। মা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতো, "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"। আমাদের বাড়িতে হিন্দু, মুসলমান সবার ছিল অবারিত দ্বার। কানুনগোপাড়ায় আমাদের অনেক মুসলমান প্রতিবেশী ছিল। পৌষ পার্বণে ওরা যেমন পিঠে পায়েস খেতে আমাদের বাড়ি আসতো আমরাও তেমন যেতাম ঈদের দাওয়াতে ওদের বাড়ি। মা সবসময় বলতো, "সব ধর্মের মূল শিক্ষা এক। কোন ধর্ম কখনো অসৎ কোন কাজ করতে শেখায় না বা কারও ক্ষতি করতে বলেনা। এই যে এত ধর্ম নিয়ে হানাহানি এগুলো সব মানুষদের তৈরী।" মাকে কখনো পুজো পাঠ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখেনি। মা বিশ্বাস করতো –

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মা আমাদের সবসময় বলতো, "দিনে একবার অন্ততঃ একটা ভালো কাজ করতে চেষ্টা করবে। অকারণে কাউকে দুঃখ দেবে না। মনে রাখবে হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। যখন ঠাকুরকে প্রণাম করবে তখন কখনো নিজের জন্য কিছু চাইবেনা। সবসময় বলবে সবার মঙ্গল করতে।"

মাকে দুবার আমার এখানে মানে শিকাগোতে নিয়ে এসেছিলাম। প্রথমবার বাবা আর মা দুজনে এসেছিল। সেবার খুব ভালো লেগেছিল মা'র। কিন্তু বাবা চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার মা যখন এসেছিল তখন মা'র একেবারে ভালো লাগেনি। সকালে আমরা কাজে বেরিয়ে যেতাম। ছেলে, মেয়ে ও স্কুলে চলে যেত। সারাদিন একা এক মা'র আর দিন কাটতো না। মা বলতো, "এত চুপচাপ, একটা লোক দেখা যায়না। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ নিজে শুনি। তুমি বাপু যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। দেশে বারান্দায় দাঁড়ালেও কত লোকজন দেখা যায়, কথা শোনা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প, কবিতা, উপন্যাস পড়তে মা খুব ভালোবাসত। দাদাভাই বা আমার মেজদার ডাক নাম গোরা। মা'র কাছে শুনেছি মেজদাকে নিয়ে মা যখন সন্তান-সম্ভবা তখন কবিগুরুর "গোরা" উপন্যাসটি পড়েছিল। আর মনে মনে ঠিক করেছিল ছেলে হলে নাম রাখবে গোরা। আমার মিতা ডাক নামটাও মা "শেষের কবিতা" থেকে রেখেছিল। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি মা কবিগুরুকে সবসময় রবি বাবু বলে উল্লেখ করতো।

মা'র প্রিয় রবি বাবুর "বিপদে মোর রক্ষা করো" কবিতাটি মা আমাদের শিখিয়েছিল প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো। রোজ সন্ধ্যা বেলা আমরা ভাইবোনেরা মা'র সাথে গাইতাম সেই প্রার্থনা সঙ্গীত। এই প্রার্থনাটা আমি আমার ছেলে আর মেয়েকেও ওদের ছোটবেলায় শিখিয়ে ছিলাম। সেই প্রাথনার কয়েকটা লাইন দিয়ে আজ এখানে শেষ করছি।

"বিপদে মোর রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা –
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়। ------
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

মা'র কাছে শেখা এই প্রার্থনা নিয়ে মা আমার সাথে রয়েছে আজও।

তপনজ্যোতি মিত্র

মা

সব কিছু যেন আজ ধুয়ে মিশে যাচ্ছে। কোন আর্তি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে। না ফোটা ফুলগুলো অগ্রন্থিত পাণ্ডুলিপির মত তাদের বিস্ময় ধারণ করে আছে। কে জানবে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের বাইরেও আছে ভালোবাসার কোন গ্রন্থি, কোন মেলবন্ধন ?

সুরমা কাঁদলেন – রাজ্য জয় করেও কোথায় যেন কেউ হেরে যায়। সুরমার ত শুধু হেরে যাওয়ার চুপকথা। শুধু ইন্দ্র বলতেন – তোমাকে পারতেই হবে মণি।

অনেক চেষ্টা করেও কোনও সন্তান হয়নি। তাই সেই কন্যাশ্রম। প্রতি শনি রবিবার ইন্দ্রের সঙ্গে সুরমা আসতেন। মাতৃস্নেহ ? জানা নেই ।

তবু তাঁরা এলেই কন্যাগুলোর মুখ উজ্জল হয়ে উঠত – সেই কি ভালোবাসা ? নদীর স্রোতের মতন ? মা ডাক শোনার জন্য সুরমার আকুল আর্তি আকাশের মেঘের মত হয়ে থাকত। সবাই ডাকত মা বলে – শুধু একজন বাদে, যেন সে জানত এইসব খেলা বড় কৃত্রিম। অথচ তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন সুরমা। ঠিক সময়ে নিজের মেয়ে হলে ঠিক এই বয়সই তো হত।

সুরমা তার নাম দিয়েছিলেন কল্যাণী, আর তার জন্যে উজাড় করে দিয়েছিলেন হৃদয়। সকলের জন্যে যেসব উপহার নিয়ে আসতেন সুরমা, কল্যাণীর জন্যেও তাই। তবু কোনও এক গভীর ভালবাসায় কল্যাণীর জন্যে আনা সেই সব উপহারগুলো হীরের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেন। কল্যাণী উপহার নিত অন্যদের মত, কিন্তু কোন এক কঠিন নীরবতা তাকে ঘিরে থাকত। যেন অভিমানিনী বুঝত তার আসল মা তার জন্মের পর তাকে চিরকালের মত ছেড়ে গেছে। তাই তার অভিমান, বুকভরা দুরন্ত অভিমান। কঠিনকে ভালবাসা অত সহজ নয় – সুরমা কাঁদতেন। শুধু ইন্দ্র বলতেন – তোমাকে পারতেই হবে মণি। যেন একজনের ভালোবাসা জয় করতে পারলেই খুলে যাবে উদাসতম মাঠের দিগন্ত।

সুরমা সবাইকে জনে জনে ডাকতেন – কি খাবি রে ? সবাই উত্তর দিত, শুধু একজন ছাড়া। কোনওদিন সুরমা আনতেন লুচি আর আলু ফুলকপির তরকারি, কোনওদিন আনতেন ভাত আর মাছের ঝোল, কোনওদিন পায়েস পিঠেও থাকতো খাবারের সঙ্গে। কন্যেরা কি যত্নে যে খেত – সুরমা আনন্দমুগ্ধ হয়ে দেখতেন। শুধু একজন নির্লিপ্ত উদাস মুখে খেয়ে যেত। সুরমা যদি বলতেন – আরও নিবি ? সে উত্তর দিত না, যেন বুঝিয়ে দিত খাওয়ানোর ভালোবাসা তো শুধু সুরমার। সুরমা অশ্রুসজল চোখে হয়তো দিতেন আরও দুটো লুচি বা আরো দুটো মাছের টুকরো বা আরো দুহাতা পায়েস, সে চুপ করে খেয়ে নিত।

আজ সুরমা বসে আছেন ঘরে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাগানের গাছগুলোর দিকে। বসন্ত কি এলো, পলাশ কি ফুটলো, গোলাপের গন্ধে কি ভরে উঠল বাগান ? একটু পরে ইন্দ্র ফিরলেন, তাঁর মুখ ফ্যাকাশে তা সুরমার নজর এড়ালো না। গভীর রাতে যখন একবার ঘুম ভাঙলো, দেখলেন পাশে ইন্দ্র নেই। বারান্দায় যেন কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখ থেকে কি ঝরে পড়ছে অশ্রুকণা ?

দুরারোগ্য ক্যান্সার। অবস্থার উন্নতি হয়নি আর। যখন অন্তিম দিন এলো, সুরমা হাসপাতালে। কন্যাশ্রমের মেয়েরা সার বেঁধে এসে কাচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। তখনই কি কেউ মা বলে ডাকলো ? আর্তিময় সেই ডাক ! এই কি সেই ডাক, যে ডাক শোনার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থেকেছেন সুরমা।

চলে যাচ্ছে সময়, ভালোবাসার দরজা খুলে চলে যাচ্ছে জীবন। আহ, অনেক কষ্টের পর আজ কী শান্তি ! তোরা সবাই ভালো থাকিস সোনারা, ভালো থাকিস কল্যাণী। একটু উঁচুতে তোলা হাত তারপর বিছানায় এসে নামল।

কোথায় তখন পাথর ভেঙে পাগলাঝোরা নামছিল।

শাশ্বতী বসু

জননী

পরীক্ষার রেজাল্ট শিটের সাবমিট বাটনে ক্লিক করল বাসবী। যাক! এখন একটু আয়েশ করার মত দুটো দিন পাওয়া যাবে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। জীবনটা যেন বাঘের পিঠে চড়ার মত মনে হয় মাঝে মাঝে। ছুটতেই হবে বাঘের সাথে সাথে। থামলেই শেষ। বাঘের এখন একটু অবসর পরীক্ষা শেষ আর নতুন সেশন শুরু হবার মাঝে। সুতরাং বাসবীও একটু ঝিমবে। তড়িঘড়ি ডেস্ক টেবিলটা একটু গুছিয়ে দরজা লক করে সে গাড়ির পারকিং এর দিকে দু পা এগোতেই রিংটোন বেজে ওঠে মোবাইলের।

ক্যারলের নাম ভেসে ওঠে স্ক্রীনে .....।

– আফটারনুন টিতে চলে এসো। আড়াইটেতে। টনি চলে যাবে তোমায় তুলতে। দুটো পেন্টিং শেষ করলাম। মিট্রা ক্যামেলিয়াতে যা দুটো ফুল ফুটেছে না। কান্ট বিলিভ ইট ! সিজনের প্রথম। শি'স জাস্ট অ্যান অ্যাঞ্জেল । সেলিব্রেট করতে হবে তো ..... তাছাড়া আছে একটা সারপ্রাইস ! চলে এসো।

ক্যারল ঝটপট ফোন ছাড়ে বাসবীকে কোন কিছু বলতে না দিয়েই। বাসবী সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ফোন করে ক্যারলকে। বলে দেয় সে নিজেই পৌঁছে যাবে ওদের বাড়ি। পিক আপ করতে হবে না। যাক নিশ্চিন্ত। এমন হড়বড় করে মেয়েটা যে কথা বলা যায় না। ফোনটা রেখে গাড়ি চালু করে বাসবী। পার্কিং খালি। নিশ্চিন্তে আক্সিলেটরে চাপ দেয়। বাসবী ক্যারলকে একটা ক্যামেলিয়ার চারা দিয়েছিল। সেটাই আজ পত্রে পুস্পে বিকশিত। তার পদবি মিত্র।

মনে পড়ছে ক্যারলের সাথে সেই প্রথম দিনের দেখা হওয়ার কথা। তিন বছর হতে চলল প্রায়। প্রথম দেখাতেই ক্যারলকে ভীষণ ভাল লেগেছিল বাসবীর। প্রথমত এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওর ব্রাইডাল পিঙ্ক গায়ের রঙ, গ্রে রঙের জ্যাকেট আর সাদা মুক্তোর নেকলেসে ওর রূপ যেন ফেটে পড়ছিল। অজান্তেই কয়েকবার নজর চলে গেছিল। বুঝেছিল এই মহিলার সাজ সজ্জার রুচি বেশ উচ্চ মানের। তারপর আলাপ হয়েছিলো। জেনেছিল ক্যারলেরও কুকুর অন্ত প্রাণ বাসবীর মতই। সুতরাং বন্ধুত্বের ফুল ফুটতে দেরী হয় নি তাদের।

দক্ষিণ গোলার্ধের এই দেশের একটি ছোট শহরতলীতে লোকজন বাসবীকে যে নামে ডাকে তাতে বাসবী আর একটি জাপানিস খাবারের নামে কোন তফাৎ থাকে না। অর্থাৎ বাসবী এখানে "ওয়াসাবি"। একজন তো বলেই ছিল

– ওয়াও! সাউণ্ডস সো ডিলিশাস ! বাসবী মাঝে মাঝে খেপে যায়। কিন্তু করার কিছু নেই। ক্যারল কিন্তু সেই প্রথম দিন থেকেই বাসবীর নাম প্রায় পরিস্কার বলে। হালকা উচ্চারণে বিরতি দিয়ে দিয়ে সে যখন ডাকে বা-শো-ও-বী- ই, তখন কৃতজ্ঞতায় বাসবীর চোখ ছলছল করে।

ততক্ষণে গাড়ি গ্যারাজে ঢুকে গেছে। হাত ঘড়িতে প্রায় দুটো। এদের আফটারনুন টি তো দুটোর পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। তার মানে এখনই প্রায় বেরোতে হবে। প্রমিত বাইরে। সুতরাং একাই যাবে সে। জামাকাপড় পাল্টাতে হবে – টুক টাক কিছু নিতে হবে ...। অনেক কাজ।

দুপুর প্রায় সওয়া দুটো। বাসবী রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। এখানে দূষণ-মুক্ত সূর্যের তাপ এতো কড়া যে গায়ে প্রায় ফোস্কা পড়ে যায় রোদে দাঁড়ালে। তবে ক্যারলের বাড়ি বেশী দূরে নয়। হেঁটেই যাবে। বিকেলের রুটিন হাঁটাটাও হয়ে যাবে এই সুযোগে। বাসবীর মাথায় একটা মস্ত ব্রিমওয়ালা ঘাসের টুপি, কটনের ঢোলা থ্রী কোয়ার্টার প্যান্ট, সুতির টপ,

সান গ্লাস। তারপর যাবার রাস্তায় দু এক জায়গায় মাঝে মাঝে লাইন দিয়ে জুনিপার এর গাছও রয়েছে। সুতরাং অসুবিধে নেই।

রাস্তায় নেমে বাসবী তাকায় চারপাশে। জনমানব শূন্য কালো পীচের রাস্তা। সূর্য যেন ঝলকাচ্ছে। মুহূর্তের ভ্রমে মনে হয় সামনেই যেন এক টলটলে দিঘী। এটাকেই বোধ হয় মরীচিকা বলে। বাসবী দ্রুত হাঁটে।

– কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই .....

শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকায় বাসবী। সেই তিনি। সেই সাদা সাদা ছোপওয়ালা বাদামী রঙের। প্রচণ্ড বেগে ল্যাজ নাড়াচ্ছেন। আর মুখ দিয়ে অস্ফুটে ঐ শব্দ কুঁই কুঁই।

– আবার তুই? কখন এলি?

পেছন পেছন হাঁটছে। হাঁটুক। একা একা হাঁটলেই চলে আসে। কোথা থেকে যে এটা উদয় হয় মাঝে মাঝে। যেন ভুঁই ফোঁড়। প্রায় মাস তিনেক আগে দেখেছিল প্রথম। বিকালে হাঁটতে যাবার আগে কখন যেন এই ছোট্ট চতুষ্পদীটা এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। গাঢ় বাদামী রঙের লোমের ভেতর হালকা সাদা সাদা ছোপ। কানের গোঁড়ায় একটা ফুটো। এটা কী বাচ্চা? না তো ! বাসবীর মনে হয়েছিলো দিব্বি বুদ্ধি চোখে মুখে। বাচ্চা কুকুরের মত ভেবলে যাওয়া মুখ চোখ নয়। অথচ চেহারায় বাচ্চা। জাতটাই বোধহয় এরকম। তুই কোথা থেকে এলি – বাসবী মনে মনে শুধিয়েছিল সেদিন। সে শুধু ল্যাজ নেড়েছিল। পেছন পেছন বহুক্ষণ হেঁটেছিল। বড় রাস্তায় এসে ওটাকে আর দেখে নি। আবার ফেরার সময় একই গল্প। বাড়ির গলিতে ঢুকলেই তিনি এসে হাজির। বাসবী খেয়াল করে দেখেছিল প্রমিত বা কেউ সঙ্গে থাকলে এই বাদামী পুচকেটাকে দেখা যায় না। শুধু মাত্র বাসবী একলা হাঁটতে শুরু করলেই ইনি উদয় হন। তারপর আরও অনেক বার। ও অনেক খোঁজ করেছে আশেপাশের লোকজন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে কুকুরটার ব্যাপারে। কমিউনিটি হলের নোটিশ বোর্ডে এটার একটা ফটো দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। কোন সুরাহা হয় নি। হাল ছেড়েছে সে। এই মুহূর্তে বাসবীর ভালই লাগে এই সঙ্গ। খানিকটা তো হাঁটতে হবে। তাছাড়া এই মধ্য দুপুর। রোদ গনগন করছে। চারপাশ একদম নিঝুম। কেমন একটা অস্বস্তিকর নির্জনতা।

কী সারপ্রাইস দেবে আজ ক্যারল কে জানে। তবে ভাবতে ভাল লাগছে যে আজ বার্ট এর সঙ্গে দেখা হবে তার। ক্যারলের এক মাত্র সন্তান বার্ট। তার কথাই ক্যারল সারাদিন বলে। একদম বাচ্চা। সবে চার বছর।

– অনেক সময় দিই ওকে। নাহলেই মুশকিল। ক্যারল বলেছিল।

সে ঠিক! ক্যারলকে বাসবী কোন স্টাফ পার্টিতে দেখে না। এমনকি ক্রিসমাস পার্টিতেও না। বার্ট প্রি-স্কুলে পড়ে। ক্যারলের ভাষায় – খুবই স্মার্ট। লাস্ট মান্থলি পরীক্ষায় বার্ট হাই পারফরমান্স সার্টিফিকেট পেয়েছে। ক্যারল ওটা বার্টের ঘরের দেওয়ালে টানিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, তারজন্য স্পেশ্যাল ট্রিট দেওয়া হয়েছে তাকে। কী সেটা ? না এখানকার বিখ্যাত পাই শপ থেকে অর্ডার দিয়ে চিকেন পাই আনা হয়েছিলো বার্টের জন্য। ক্যারলরা নাকি ভীষণ সেলিব্রেট করেছে। আবার এই শীতেই ক্যারল সারা সিজন বুনেছে আর বুনেছে। বার্টের কোট, তার প্যান্ট, ওর ব্ল্যাঙ্কেট ..... । এই ধরণের গল্প সারাদিন ক্যারলের মুখে। যেদিন বার্ট প্রথম পার্কে গেছে সেদিনকার গল্প তো আর থামছিলই না।

ডিপার্টমেন্টের মুখফোঁড় এলকা তো বলেই ফেললো একদিন বাসবীকে একা পেয়ে – ক্যারলের সাথে দেখো বেশীদিন টিকতে পারবে না। ঘরের গল্প করে করে জ্বালিয়ে মারবে।

হাঁটতে হাঁটতে দূরে ক্যারলের বাড়ি চোখে পড়ে। লাল টাইলসের তিনকোনা ছাদ বাড়িতে ঢোকার মুখে। জানলার মাথায় মাথায় সাদা তেকোনা ফ্রেমের ঘেরাটোপ। সারা বাড়ি ঘিরে ঢাকা বারান্দা। বাসবী বারান্দায় উঠে আসে।

বারান্দার ধারে সাকুল্যান্ট এর শেলফ। লাল হলুদ মেশানো ফুল ফুটেছে। বেল বাজাতেই ক্যারল খুলে দেয় দরজা। যেন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

– কি লাভলি ফুলটা ! বাসবীর হাত থেকে ফুলটা নিতে নিতে ক্যারল বলে। "ষ্টেফানি" ! তাই না ? গাঢ় মেরুন রঙের বিশাল গোলাপটার দিকে সস্নেহে তাকায় সে।

দুজনে এগিয়ে যায়। সামনে সাজানো ফর্মাল লাউঞ্জ। সেটা পেরিয়ে ক্যারল ওকে ফ্যামিলি লাউঞ্জে নিয়ে যায়। লাগোয়া কিচেন।

– চা করি না কফি খাবে ?

– চা

– আর্ল গ্রেট বানাই তাহলে। ভাল লাগবে। বলতে বলতে কিচেনে ঢোকে ক্যারল।

বাসবীর চোখ তখন দেওয়ালে। এই দুটো পেইন্টিংই শেষ করেছে ক্যারল। আসাধারণ। দিনের আলোর রঙ এতো সুন্দর করে ফুটিয়েছে। একটা ছবিতে রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়িকে বন্দুক দেখিয়ে থামান হয়েছে। মনে হচ্ছে বন্দুক এখুনি বুঝি বা গর্জে উঠবে। আর একটাতে Sheep rearing – ভেড়ার লোম ছাঁটা হচ্ছে।

এসবই সামাজিক ইতিহাস। এভাবেই আগে রাস্তায় বন্দুক দেখিয়ে লুঠতরাজ হতো এদেশে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাসবী ভাবে আমদেরও লুঠপাঠের এই একই ইতিহাস আছে। পৃথিবী একই পথে ভ্রমণ করে। চায়ে চুমুক দিয়ে সে বাস্তবে ফিরে আসে।

– দারুণ পেইন্টিং হয়েছে ক্যারল। ওয়েল ডান। তুমি একটা এক্সজিবিশনের ব্যবস্থা করলে পারো।

– টার্টটা খাও। ক্যারল সোৎসাহে প্লেটে আজকের বানানো অ্যাপল টার্ট এর দিকে আঙ্গুল তোলে। বার্টও ভালবাসে।

– কিন্তু আজকের সারপ্রাইসটা কি তোমার ? বাসবী বলে উঠলো।

বলতে না বলতেই লাফ দিয়ে একটা বড়সড় কালো উলের বল ভেতরের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে লাফিয়ে উঠে এসে বাসবীর কোলে বসে পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হকচকিয়ে যায় মুহূর্তে। দেখে একটা লোমওয়ালা কুকুরের বাচ্চা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওর হাত চাটছে চকাস চকাস করে।

ক্যারল উচ্চকিত হেসে ওঠে।

– এটাই তোমার আজকের সারপ্রাইস বাসবী। গতমাসেই এসেছে জাস্ট। ওর নাম গাস। কোলে উঠতে ভালবাসে। সুন্দর তাই না ?

বাসবীর বিহ্বল ভাবটা ততক্ষণে কেটে গেছে। সেও সারমেয় অন্ত প্রাণ। অবস্থাটা বুঝতে তার দেরী হয় না। সে গাসের গায়ে হাত বুলায়। ভাল করে তাকায় তার দিকে।

– গাস হচ্ছে Cavoodle। হাইব্রিড, পুডল আর Cavelier King Charles Spaniel এর তাই Cavoodle। জানো ওদের আর একটা নাম Lapdog। কারণ লোক দেখলেই তার কোলে উঠে বসা চাই। তাই এই নাম। ওর কান দেখেছো ? কী লম্বা দেখো। ক্যারল গাসের কানে হাত রাখে আলতো। দেখেছো ওর লম্বা লম্বা লোম। ঠিক যেন মানুষের মাথার চুল।

যেন এক ঘোরের মধ্যে কথা বলে চলে ক্যারল।

– আমাকে উইকলি ছাঁটতে হয়। ডগ কেয়ারারকে ডাকি না আমি। নিজেই করি। একেই আট হাজার ডলার নিয়েছে ওঁর জন্য – তার ওপর এখান থেকে দু ঘণ্টার ফ্লাইটে যেতে হয়েছে গাস এর মায়ের কাছে। হোটেল খরচ – গাড়ি করে সাড়ে সাতশো কিলোমিটার ফিরে আসা ..... ভেটেরিনারি .....।

– বলো কী ? অজান্তেই বাসবী বলে ওঠে।

– এটা আমার কাছে কিছুই নয়। গাসের জন্য সব করবো .....।

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। বাসবীর চোখ যায় দেওয়ালে ঘড়ির দিকে । বলে –

– চলো বার্টের সঙ্গে দেখা করে যাই। ওকি ঘুমাচ্ছে ? দেখছি না তো ! ক্যারল সে কথার উত্তর দেয় না। মনে হয় এখনো ও যেন একটা অন্য জগতে রয়েছে। শুধু বলে –

– এসো বার্টের ঘরে যাই।

লম্বা হলওয়ে পেরিয়ে ওরা একটি ছোট ঘরে ঢোকে।

– এটাই বার্টের ঘর ।

ঘরে অস্পষ্ট আলো। সব পর্দা নামানো। সেই ম্লান আলোতেই চোখে পড়ে ঘরময় দেওয়ালে দেওয়ালে ভর্তি সার্টিফিকেট। সুদৃশ্য দামী ফ্রেমে বাঁধানো।

– তোমায় বলিনি বাশওবী। যেন অনেক দূর থেকে ক্যারলের গলা ভেসে আসে। বার্ট রোড অ্যাকসিডেন্টে চলে গেছে। তিনমাস আগে। রাস্তায় বেরিয়ে গেছিলো আমি যখন বাড়ি ছিলাম না। সুযোগ পেলেই রাস্তায় বেরিয়ে যেতো। অচেনা লোকের সাথে সাথে হাঁটত। আমার জীবন শূন্য হয়ে গেছিলো। আমি পাগল হয়ে গেছিলাম ..... গাস, গাসকে পেয়ে আমি যেন আমার প্রাণ ফিরে পেয়েছি। এই যে, এই যে আমার বার্ট .....।

ঘরের এক কোণায় ছোট্ট টুলের ওপর একটি বাঁধানো ফ্রেমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্যারল।

বাসবী স্তম্ভিত হয়ে যায়। কী দেখছে ও ? সত্যি ? ফ্রেমের ভিতর ও কার ছবি ? বাদামী রঙের ওপর সাদা ছোপ ছোপ ..... কানের গোঁড়ায় একটা ফুটো .....!!!!!!

ময়ূরী মিত্র

দুই পুতুলে

ধানফুল

বৃষ্টির সঙ্গে ঝগড়া করে মাটি ঘুমিয়ে গিয়েছিল। নাকও ডাকছিল হয়ত। সেই ডাকে গোক্ষুর ভয় পেয়ে জলে দিল ঝাঁপ। হ্যা হ্যা করে হাসল বৃষ্টি। মাটিটা যেমন বেআক্কেলে তেমনি ধান্দাবাজ। সারাক্ষণ আকাশের তলায় বুক চিতিয়ে শুয়ে থাকবে আর ঘ্যানঘ্যান করবে – ও বৃষ্টি একটু ঝর। আমার গাটা ধুয়ে দে একটু ! ও বৃষ্টি – তুই কি হাবা না কালসাপ! বুঝিস না আমার যন্তন্না ? ওরে আহাম্মক – একমাস ধরে মোটে আমার কাছে আসিস নি। শরীর খড়খড়ে হয়ে গেল। বুকের গাছ শুকিয়ে গেল। মানুষ শস্য পাবে না। গরু খড় পাবে না। দুধ হবে না গরুর। বাচ্চা বুড়ো সবার পেট খালি থাকবে রে ! আয় আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

মাটির এইসব ফালতু কাতরানি একদম পাত্তা দেয় না বৃষ্টি। এমনিতেই চব্বিশ ঘন্টা জলের বায়নায় মঙ্গল বুধ শুক্কুরদের জলই দিতে পারে না বৃষ্টি। গ্রহজগত চিরশুকনা রেখে মাটিতে জল ঢাললেও মাটির তেষ্টা মেটে না। যত ঝরে বৃষ্টি – তত শোষে মাটি ! নিজে খায় – শরীর নরম করে পুঁইপোনাদের ডাকে। মাটির নরম শরীর থেকে আবার গাছপালা জল টানে। মানুষ পুকুরে মাজা ঘটি চুবিয়ে রান্নার জল ভরে। মাটি বলে – গাছ, মানুষ, বাঘ, ইঁদুর সব তার সন্তান। কতদিন বৃষ্টি ঝাঁঝিয়েছে – রাক্ষুসী টেনে টেনে আমাকে মরু বানালি, তবু বিনিময়ে কিছু দিলি না। দেওয়া নেওয়া না থাকলে প্রেম হয় ? আর প্রেম না হলে তোকে অকাতরে দেওয়ার ইচ্ছেটা আমার জন্মাবে কী করে! যা দেব, তাই দাক্ষিণ্য দেবার মতো হবে রে মাটি ! ও মাটি – দাক্ষিণ্যে যে বড় হিসেব এসে যায় রে। আমি কী করি ! তোকে যাতে কেবল আনন্দে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে এমন কিছু কর মাটি। নাহলে -যা! বাতাস খেয়ে গর্ভ ভরা হারামজাদী। সাহস করে ভালোবাসতে পারলি নে যখন আমায়, তখন মর রুখু হয়ে। ওমন "নেই প্রেম"এর জগতে করুণার খেলা করে নিঃশেষ হতে বয়ে গেছে আমার। আজই সিদ্ধান্ত শুনে নে মাটি। আর যাব না তোর কাছে।

বৃষ্টি আর আসবে না ! আর আসবে না বৃষ্টি ! দুপুরের মেঘ দেখে মাটি। জলহীন মেঘ ঘোড়ার খুড়ের মতো লাগে। ক্লান্ত মাটি একটানা ঘুমোয়। বাচ্চা বাচ্চা গাছ পাতা হারাবে ! ও দেখার চেয়ে নির্বোধ হয়ে ঘুমোন ভালো।

কান্নার আওয়াজে ধড়ফড় করে জাগল মাটি। জনকলালের ঘর থেকে কান্নাটা আসছে না ? কদিন ধরেই জনকের মেয়েটা পেটের যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। হাতুড়ে ডাক্তারও গেল তো দুবার তিনবার করে মেয়েটাকে দেখতে ! আহা তাও মরে গেল মেয়ে ? শস্যের অভাবে একগাদা ওল খেয়ে ফেলেছিল হয়ত কিংবা একমুঠো বুনো শাক ! মাটি হাপুস।

সর্ষের তেলে দীপ জ্বালিয়ে জনক শ্মশানে গেল। মেয়ে পোড়াল।

রাত গভীর। জনকের চালে লক্ষ্মীপ্যাঁচা ডাকল। তারা চাঁদ উপুড় হয়ে রাতচরাদের রূপ দেখছে। ফটটাস ! মাটির বুকে কী যেন পড়ল। তারার আলোয় ঠাহর করার চেষ্টা করল মাটি। একী ! এটারও হাত পা পেট আছে ! তবে চামড়া নয় তো ! প্লাস্টিক – কঠিন প্লাস্টিক ! কিশোরী সীতার ছোটবেলার পুতুলটা ফেলে দিয়ে গেল জনক। হিঁচড়েপিচড়ে ওঠার চেষ্টা করল মাটি। প্লাস্টিকের পুতুলটাকে কোলে নেবে সে। পারল না। অনেক সন্তানের জন্য তাকে তো পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকতে হয়। কেবল একটিকে কোলে নেয় কী ভাবে ! তার ওপর প্লাস্টিকের বস্তু ধরার কৌশল তো শেখেনি সে ! চিরকাল সবুজ নয় জীবের চামড়া রক্ত মাংস ছুঁয়ে বেঁচেছে মাটি ! কাণ্ড দেখে ওপর থেকে বৃষ্টি বদমাশের হাসি দিল। তারপর তুমুল বেগে .....।

মাটি ভিজে একসা। হায় রে ! এত বৃষ্টিতে চোখ যে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ! কোথায় - কোথায় সীতার পুতুল ! ওকী রে ! পেটের মধ্যে কী নড়েচড়ে রে ! অবাক মাটি ! বৃষ্টি তার শরীর ভিজিয়ে ভিজিয়ে কাদা করে দিয়েছে। তারপর সেই কাদা আপনা হতে সরে সরে মাটিগর্ভে যাওয়ার পথ করে দিয়েছে প্লাস্টিকের পুতুলটাকে। পুতুলের আঁকা কালো মণি ওপরে উঠছে আর নামছে। চোখের পাতা তার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। মাটির পেটে পুতুল এবার পদ্মভ্রূণ হবে।

বহুযুগ বাদে বৃষ্টি আজ মাটিকে বুকে পেয়েছে।
প্রতি ফোঁটা লক্ষ জিভ হয়ে মাটিবউয়ের স্বাদ নিচ্ছে।
মাটিকে আজ তার কিছু দিতে বাকী নেই আর।
আর কিছুক্ষণ পর নতুন সীতা হাঁটবে ভূপৃষ্ঠে !

দশরথপুত্তুরের গুষ্টির তুষ্টি করে এ সীতা থেকে যাবে তার বাবা মায়ের মিলনভূয়ে ! বৃষ্টি মাটির মাঝটিতে !

কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীপেঁচা

কোটের বোতামগুলো আরো একবার ভালো করে দেখে নিল। নাহ ! আটকানোই তো আছে – সকালে বেরোবার সময় মা জানকী যেভাবে আটকে দিয়েছিলেন ঠিক সেরকমই টাইট আছে। তাহলে চামড়ায় এত ঠাণ্ডা লাগছে কী করে ! চামড়া ফুটো করে দিচ্ছে পোষের বাতাস। হাতের থলিটা কাঠের হাতী ঘোড়ায় ভর্তি। যথেষ্ট ভারী। তবু দেখো – একটুও ঘাম হচ্ছে না। শীতলতা মোটে সহ্য করতে পারে না কুশ। শীতের ঋতুতে ঠিক সন্ধে পর্যন্ত পুতুল তৈরী করে। কাঠের পুতুলে হাত বুলিয়ে তেলো গরম করে। রাত নামলেই জানকীর হাতে ধোঁয়া ওঠা ভাত আর ঘি দেওয়া অড়হর ডাল মাখা খেয়ে নেয় গপাগপ। আর তারপরই কুশ জানকীর বুকে। কিশোরটি হয়ে গেল – কাঠের পুতুল গড়ে কত নাম করল – তবু জানকীর বুকে তার সবথেকে আরাম। কুশের এইসব ছেলেমি দেখে জানকী মৃদু হাসে।

কুশ জিজ্ঞেস করে –

মা, রোজ যে এতখানি করে কপাল থেকে সিঁথি অবধি সিঁদুর দিস – বাবা কবে আসবে জিজ্ঞেস করলে হাসিস কেন রে মা ! সে কোথায় গেছে – কবে গেছে – আসবে কবে – বলবি নে কিছুতেই ? ওমা ! আমি যে জ্ঞান হওয়া থেকে বাপকে দেখিনি। তোর কি একবারও মনে হয় না – বাপ আসুক না আসুক – ছেলেটার কথার একটা উত্তর অন্তত দিই !

প্রতিবারই এসব বলতে বলতে কুশ কাঁদতে থাকে। জানকীর মুখে সেই সামান্য হাসি। ছেলেকে বুক হতে নামিয়ে কাঁথা চাপা দেয়। ফোঁপাতে ফোঁপাতে কুশ ঘুমোয়। জানকী গাঢ় নীল শাড়িতে সাদা সারস সেলাই করে। জানকীর সংলাপ নেই। তার হাতের সেলাই কথা বলে। গঞ্জে আসা বিদেশী বণিক জানকীর কাঁথা শাড়ি আর কুশের কাঠের পুতুল বেশী কেনে।

বৃষ্টির জল কোটে ঝাঁপাতেই হুঁশ হয় কুশের। পুতুলের থলি বুকে চেপে ধরে। জল লাগলে কাঠের পুতুল ঢেপসি হয়ে যায়। কাল গঞ্জে পৌষের মহাকালী পুজো। বিশাল মেলা বসবে। তাদের গাঁয়ের সব শিল্পী মেলায় শিল্পপণ্য বেচবে। জানকী আর জানকীর ছেলে বেচবে কাঁথা শাড়ি ও কাঠের পুতুল। মেলার আগে শিল্পসঙ্ঘের প্রধান শিল্পী সবার নমুনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কুশ মায়ের তৈরী নীল রঙে সাদা সারসের শাড়ি ও কটি হাতী ঘোড়া ও একটি প্যাঁচা নিয়ে গিয়েছিল। শিল্পসঙ্ঘের খুব পছন্দ হয়েছে মা ছেলের কাজ। এবারও তারা মাঠের শ্রেষ্ঠ স্থানে দোকান করার অনুমতি পেয়েছে। কুশ বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছল। সেখানে জানকী পোষের বৃষ্টিতে ভিজছে। কুশ চেঁচাল –

ও মা ! শিগগির কুপির আগুনে হাত দুটি ছোঁয়াও গো মা। জ্বর হবে যে !

মাঝরাতে মেলা শেষ হল। রূপসী বারাঙ্গনা সুঠাম পুরুষ নিয়ে যে যার ঘরে যাচ্ছে। কেউ কেউ উদ্যানেই আঁধারের সুবিধে নিচ্ছে। বিদেশী বণিক এলেমদার। ক্ষমতা ও ক্ষুধা দুইই তাদের বেশী। কেবল কমলা তার বণিকসাথীকে নিয়ে

অপেক্ষা করছে। জানকী আর কুশকে ঘরে পৌঁছে তবে সে বণিকের শরীরে ঢুকবে। মা ছেলে দুইই বড় ভাবুক। পৌঁছে না দিলে রাতের কালোয় যদি পথ হারায়। শীতের ঠেলায় কুশ ঘুমিয়ে গেছে পুতুলের মধ্যে – শক্তপোক্ত হাতী ঘোড়ারা এখন তার পাশবালিশ। জানকী গোছগাছ করছিল।

– জানকী ! চিনতে পার ?

জানকী দেখল এক অপরূপ বণিক তার সামনে দাঁড়িয়ে। কণ্ঠে তার কত যে রত্নমালা। ও মুখ জানকীর বড্ড চেনা। সেও নিশ্চয় জানকীকে বড্ড চেনে।

বণিক বলল – দেশ বিদেশে যেখানেই বাণিজ্য করতে গিয়েছি সবাই তোমার সেলাই করা শাড়ি চায় জানকী। পশ্চিম গোলার্ধের রাজারা বলে – তারা আমায় লক্ষ লক্ষ হীরকমুদ্রা দেবে – যদি আমি যদি ভারতবর্ষ নামক গ্রামে গিয়ে জানকীর শাড়ি তাদের রাণীদের জন্য নিয়ে আসি ! এবার বাণিজ্যে বেরিয়ে তাই প্রথম ভারতবর্ষ আসব ও তোমার সঙ্গে দেখা করব স্থির করেছিলাম। দেবে জানকী তোমার সব শাড়ি ? হ্যাঁ ? দেবে ? আমি দুইগুণ দাম দেব।

জানকী কাঠ। মাটিতে থেবরে বসে এক একটা করে শাড়ি বণিকের পেটিকায় তুলে দিতে লাগল আর প্রত্যেকটা শাড়ির নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য বলে গেল।

বণিক আর্তস্বরে বলে উঠল – জানকী আমি তোমায় ফেলে চলে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। টাকার জন্য তোমায় ফেলে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমার অনেক টাকা। তাই দ্বিগুণ মূল্য তোমায় দিয়ে যেতে চাই। অর্থ পেলে তোমার আর কুশের বাকি জীবন চলে যাবে।

শূন্য থলি নিয়ে যেতে যেতে জানকী বলল –

কুশ বণিকের থেকে শাড়ির দামের টাকাটা নিয়ে আয়। দ্যাখ – শাড়ির দাম আমি যোগ করে লিখে দিয়েছি বণিককে। চোখ কচলে নে রে কুশ। ঘুমচোখে গুণ করতে ভুল হয়। আর হ্যাঁ – অনেকগুলো শাড়ি নিয়েছে বণিক। শেষের শাড়িটা ওকে ফাউ দিস।

বণিক কুশকে আঁকড়ে ধরে বলে – কুশ মাকে বল আমি যা দাম দিচ্ছি সেটা নিতে। তুই আমাদের একটাই ছেলে কুশ। দ্বিগুণ দাম পেলে তুই শিল্পকর্ম শিখতে বিদেশ যেতে পারবি।

দূরে গিয়েও কথাটা শুনতে পায় জানকী। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে – কুশ জন্মাবার পর আমার গর্ভ পচে যায়। জরায়ু দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোত। তখন আমি যেখানে বসতাম সেখানের সব জোয়ান পালাত যে বণিক। নাহলে গুণে গুণে ছেলে বিয়োতাম।

বণিক দীপঙ্কর গাঢ় নীল শাড়িটা দেখেছিলেন।

কালো রাতে নীল আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। সাদা সারস শুধু ডগমগ করে। কুশ শাড়ির দাম গুণে নিচ্ছে।

জানকী হাসল। তবে সে হাসি মহাকালী পুজোর মহাআঁধারে দীপঙ্করের কাছে পৌঁছল কিনা তা দেখার সময় নেই। কমলা তাদের পৌঁছে দিয়ে পরপুরুষে মজবে সারারাত। কমলার একরাতের মিঠে সংসার। কুশকে বলবে, যাবার পথে পুতুল দিয়ে মাসির ঘরটা সাজিয়ে দিয়ে যেতে। কমলকনের ফুলবাসরে জানকী আজ পুতুল যৌতুক দেবে। হয়ত ক্ষণিকের বরবউয়ের শরীর জাগলে পুতুল কথা কবে।

ইন্দিরা চন্দ

আমিনা, আরতিদি ও গোলাপ

আকাশী নীল

রীলে আর ববীনে পাক খেতে খেতে নীল সুতো ক্লান্ত, জড়িয়ে জট পাকিয়ে ছিড়ে যাচ্ছে। আর কাঁচি চোখ পাকিয়ে কুচ করে কেটে দিচ্ছে। সেই সকাল থেকে ওরা নীল আকাশ, লাল আর বাদামী ডানা মেলা পাখি ফুটিয়ে তুলছে অ্যাপ্লিকে। নিখুঁত ভরাট নীল স্যাটিনের ফোঁড় আমিনার হাতের ছোঁয়ায় আকাশটা উদার হয়ে উঠছে, আর পাখি দুটো যেন মুক্তির আনন্দে ডানা মেলে উড়ছে। এই অ্যাপ্লিক হয়তো ছোটদের জামায় বসবে বা কিশোর কিশোরীর জ্যাকেটে কে জানে! আমিনা অতো ভাবে না, ও শুধু জানে কালকের মধ্যে দিতে হবে বারশোটা, ওস্তাগর বাপ বলে গেছে, কাল বিকেলে আসবে নিতে। প্রথমবার সময়ে কাজ শেষ করতে পারেনি আমিনা, সেই ভুল আর এ জীবনে করবে না সে।

নীল সুতোটা কিছুতেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না, কখনো লাল, কখনো বাদামীর গায়ে পড়ে জড়িয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছে, মেশিনের তেল, কাঁচির কচকচানিও ওকে বশে আনতে পারছে না। আমিনা নাজেহাল, মুখ ভয়ে শুকিয়ে কাঠ, মোটে চারশোটা মতন হয়েছে এখনো আরো আটশোটা বানাতে হবে, এসময় মেশিন খারাপ হলে ঠিক করার লোক পাবে কই। বাপের চোখটা মনে পড়তেই বুকের ভিতর হাতুড়ির আওয়াজ শুনতে পেল। ঘরের মধ্যের যত সুতো, টুকরো রঙবেরঙের ছিট কাপড়, কাঁচি, মাপার ফিতে সবার বুক দুকপুক করে উঠল, কোণায় রাখা জলের কুঁজোটাও নড়ে উঠল যেন আমিনার সাথে সাথে। শুধু এই নতুন নীল সুতো সে কিছু শুনতে নারাজ দম বন্ধ হয়ে আসছে তার এই বদ্ধ ঘরে। এই এক চিলতে জানলা বিহীন ঘরে, স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধের মাঝে, যেখানে দুটো বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই, সেলাই মেশিনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, সেখানে কেউ কেমন করে খোলা আকাশ ফুটিয়ে তুলতে পারে ? আজীবন খাঁচায় বসে কেমন করে মুক্তির আস্বাদ কল্পনা করতে পারে ? এই কাজটা সময়ে শেষ করলে কি আমিনার মুক্তি ? আর না করতে পারলে ? কে জানে ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীল সুতো তাকায় আমিনার দিকে। ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, সুতোটা মন দিয়ে সুঁচে ঢুকিয়ে পা চালালো আমিনা, মেশিনের একঘেয়ে শব্দ রাতের অন্ধকারের সাথে মিশে গিয়ে তৈরী হচ্ছে নীল আকাশে উড়ান মেলা দুই পাখি।

*** *** *** *** ***

স্বপ্নের লাঠি

আজ নারী দিবস, চারিদিকে সাজ সাজ রব, আকাশদীপের মেয়েরা আজ সবাই নতুন শাড়ী পরবে, সমবেত গান হবে, যে যেটা পারে করে দেখাবে, এই আবাসনে আজ উৎসবের মেজাজ। প্রতি বছর এই দিনে আকাশদীপে উৎসব হয়, কখনও গায়ক, কখনও সিনেমার নায়ক নায়িকা, কখনও কোন নামকরা ক্রিকেটার এসে এই দিনটাতে মেয়েদের উৎসাহ দিয়ে যায়। আজ প্রথমবার, একজন মন্ত্রী আসছেন, মহিলা ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের থেকে, চারিদিকে তাই একটু বেশী আয়োজন। মঞ্চের ওপর এখন আরতিদি, "এই বিলু, মাইকগুলো নিয়ে আয়" – আরতিদি হলেন আকাশদীপের সর্বেসর্বা। দশ বছর আগে মিনতি আর রত্না এই দুজনকে নিয়ে শুরু হয়েছিল আকাশদীপ, মাদ্রাজের সুনামিতে পরিবারের সবাই কে হারিয়ে যখন ওরা রাস্তায়, তখন আরতিদি ওদের হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকেই শুরু। আকাশদীপের এখন দোতলা বাড়ি, বাগান, হলঘর আর গরিব বাচ্চা মেয়েদের সকালের স্কুল, দুপুরে মেয়েদের নানা রকম ক্লাস, কম্পিউটার থেকে বেতের ঝুড়ি।

"তোরা দেখছি আজ আমায় ডোবাবি" – আরতিদির উৎকণ্ঠা ভরা চিৎকারে আরো তটস্থ হয়ে উঠলো চারিদিক, শুধু আমি আমার ভাঙা পা নিয়ে বসে রইলাম – স্টেজে রাখা টেবিলে সাদা ফুলকাটা টেবিল ক্লথ, চেয়ারগুলো তে সাদা জামা গোলাপী স্যাস, মাঝের চেয়ারটাতে লাল বো দেওয়া স্যাস – মন্ত্রি ম্যাডামের জন্য স্পেশাল; মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা, আজকের এই ঝলমলে হই চই এর সাথে কত তফাৎ। ভালই হয়েছে চেয়ারগুলো জামার তলায় মুখ লুকিয়েছে, অন্ততঃ কেউ তো লজ্জা পাচ্ছে।

"না না, আপনি একদম ভাববেন না বঙ্কিম বাবু, আপনি ম্যাডাম কে নিয়ে ছয়'টাতে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান শুরু হবে , আমরা একদম রেডি।" ফোন রেখেই কর্কশ চিৎকারে বাড়ি মাথায় করলেন আরতিদি।

বঙ্কিম বাবু, হ্যাঁ, ঐ লোকটাই তো ছিল কাল রাতে আরতিদির সাথে। তেল চুপচুপে মাথা, কপালে তিলক, আর কুতকুতে দুটো চোখ দিয়ে স্বপ্না কে মাথা থেকে পা অবধি জরিপ করছিলো। চোদ্দ বছরের মেয়ে স্বপ্না বিহার থেকে এসেছে সাতদিনও হয়নি, বাংলা বোঝে না, সে কিছু বুঝতে পারার আগেই একটা লোক হ্যাঁচকা টানে তাকে দরজার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। মেয়েটি মাটিতে শুয়ে আরতিদির পায়ে পড়ে গেল, বুকফাটা চিৎকারে, কান্নায়, দেহাতি ভাষায় কাকুতি মিনতি করতে থাকলো লোকটা তাও টানা বন্ধ করলো না, আর কিছু না পেয়ে আমার একটা পা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল, লোকটা এবার আমাকেও স্বপ্নার সাথে হেঁচড়ে নিয়ে চললো। দরজার কাছে এসে স্বপ্নার মুখ বেঁধে, বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলো, আর আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের ভেতর। দেয়ালে ধাক্কা লেগে একটা পা দুটুকরো হয়ে ছিটকে গেল, অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি আরতিদির হাতে মোটা টাকার ব্যাগ দিয়ে ঐ বঙ্কিম হাত নেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আরতিদিকে যে এত কুৎসিত দেখতে সেটা আগে কখন খেয়াল করিনি, আজ ভাল করে দিনের আলোতে দেখে মুখটা আরো নৃশংস লাগল। লালবাতির গাড়িতে মন্ত্রি এসেছেন, গান শুরু হয়ে গেছে, কানে আসছে, মনে মনে খুশি হলাম পা'টা ভেঙে গেছে বলে, না হলে ঐ শয়তানগুলোর জন্য সাদা জামা রঙিন স্যাস পড়ে আমাকেও ঐ স্টেজে থাকতে হত, ওদেরকে বসতে দিতে হত, দুঃখ একটাই, এবারে চেয়ার ছিলাম তাই স্বপ্না কে ওরা নিয়ে যেতে পারলো, পরের বারে লাঠি হবো। মানুষ যা পারে না লাঠি তা পারবে . . .

*** *** *** *** ***

গোলাপকথা

চোখ দুটো শুধু এক ঝলকের জন্য দেখে ছিলাম সেদিন। আয়না দেখে সে এলো খোঁপায় সযত্নে সাজাচ্ছিল যখন আমায়, রেশমি চুলের পরশে, সুবাসে আমি বিভোর . . . লোকে বলে আমার সৌন্দর্য, সুগন্ধ নাকি ভুবন ভোলানো, সারা পৃথিবী জুড়ে আমার খ্যাতি, রঙে, রূপে, গন্ধে . . . কি জানি ! আমি তো হারিয়ে ছিলাম নিজেকে ওর জন্য, ওর রূপে মুগ্ধ আমি। ওকে দেখি, রোজ সকালে কেমন আনমনে ঘুরে বেড়ায় আমার, আমাদের চারপাশে। নরম হাতে আমাদের ছুঁয়ে দেখে, গালে ঠেকিয়ে গুন গুন করে। মিষ্টি সুরেলা গলা শুনে আমরা সবাই কেমন চনমন করে উঠি। গলা বাড়িয়ে অধীর আগ্রহে সুরের আরো কাছে চলে যেতে চাই। ভাললাগে, ভালবাসায় যত্নে থাকতে কার না ভাললাগে! মনে হয়, দিয়ে দি সব উজাড় করে, সব রং , সব গন্ধ ঢেলে দিয়ে ভরিয়ে তুলি বাতাস। কত কথা বলে সে আমাদের সবার সাথে। ওর গল্প, মনের জমে থাকা মেঘ, আনন্দ, অস্থিরতা, রাগ, দুঃখ – সব আমাদের সাথে ভাগ করে নেয়। দিনের ঐ সময়টা একেবারে কাছের মানুষ – তারপরেই হয়ে উঠে অচেনা, দূরের, অপরিচিত, যখন দেখি বেরিয়ে যেতে গাড়ি করে, আর সন্ধ্যার সলাজতায় ফিরে আসতে আবার। আজকে পরেছে হাল্কা গোলাপী শাড়ি, কানে গোলাপী মুক্ত, খোঁপায় আমার গোলাপী রংটা খুব মানিয়েছে, কিন্তু বাঁ দিকের কপালে একটা গাঢ় গোলাপী দাগ চোখের কাজলও যেন বেশী কালো . . . "কি হলো গোলাপ, এখনও হলো না তোমার ?" গম্ভীর কর্কশ গলার শব্দে একটু কি কেঁপে গেল ওর শরীর ? আয়নায় চোখদুটো আর দেখা হল না, আমি খসে পড়ে গেলাম চুল থেকে মাটিতে, জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে . . .

সৌমিক বসু

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

চারিদিকে ভীষণ অগ্নি। কর্দমাক্ত, পূতিগন্ধময় পরিবেশ, নদীর জল আগুনের মতো গরম, গাছের পাতা ক্ষুরের মতোন ধারালো। শেষের সেদিন আসন্ন, একেই বোধহয় নরকযন্ত্রণা ভোগ করা বলে। দূরে একটি চিতাতে এক মহিলা পুড়ছেন দেখা যাচ্ছে। এ কি তবে নির্ভয়া ? না কি ওই বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছেন সেই প্রিয়াংকা রেড্ডি। পাঠক চলুন আরেকটু নিকটে গিয়ে দেখা যাক।

না, উনি হলেন অম্বা, কাশীরাজ কন্যা। ভীষ্ম তার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সাথে বিবাহের জন্যে কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ করে আনেন। অম্বা শ্বাল্বরাজকে মনে মনে পতি হিসাবে বরণ করেছিলেন শুনে ভীষ্ম তাকে শ্বাল্বরাজের কাছে ফেরত পাঠালেন। কিন্তু শ্বাল্বরাজ অন্যের দয়ার দান নেবেন কেন ? তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন অম্বাকে। বেচারি অম্বা ..... ক্ষোভে, অপমানে চিতার আগুনে জীবন উৎসর্গ করলেন তিনি।

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান"

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সাথে মিল পেলেন কি ? ইদানীং সবাই দেখছি গেল গেল রব তুলছেন, নারীর সম্মান নাকি হঠাৎ আজ ভুলুণ্ঠিত, মানে আগে যেন সবকিছু ঠিক ছিল। আসলে বোধহয় তা নয়, আমাদের সমাজের এই ক্যান্সার ধরেছে অনেকদিন। এতদিন ভিতরে ধামা চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল, এবার রীতিমত কটুগন্ধ সমেত পুঁজরক্ত বের হতে শুরু করেছে।

নারীসম্মান, লিঙ্গবৈশম্য শব্দগুলি খুব আলোচিত হচ্ছে সম্প্রতি। চলে আসুন প্রাচীনকালে, যুগে যুগে কথিত ও পঠিত হয়ে এসেছে নারীকে হরণ করে বিবাহ করতে পারলে তার থেকে বীরত্বের কিছু হতে পারে না। তারমানে সেই যুগেও সে ছিল কমোডিটি, আজও সে হয়ে আছে ভোগ্যপণ্য। আর বীরভোগ্য বসুন্ধরার কথা তো ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় আমাদের। এরকম হাজার হাজার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে আমাদের পুরাণ ও মহাকাব্যতে। যেমন ধরুন পুত্রলাভের আশায় কোন কোন মহীয়সী নারীকে কোন কোন দেবতা/মুনি/ঋষির সাথে রাত্রিযাপন করতে হয়েছিল, তা ইদানীং কালের "ভিকি ডোনার" এর গল্পকে হার মানাবে। আর কখনো দেখেছেন বা পড়েছেন "কন্যাসন্তান" লাভের আশায় কোনো রাজা যজ্ঞ করছেন বা কোন দেবতাকে কামনা করতে বলছেন ? দ্রৌপদী স্বয়ংবর সভায় মালা দিলেন অর্জুনকে আর কুন্তীর কথামতন তা বেমালুম হয়ে গেলো "যা এনেছো, পাঁচজনে ভাগ করে খাও।" এর থেকে বড়ো পণ্যর উদাহরণ আর কি হতে পারে ? আর যাকে ভালবেসে তিনি পান্ডবদের ঘরে এলেন, সেই অর্জুন দেশভ্রমণে বেরিয়ে ফিরলেন আরো তিনজনের (নাগকন্যা উলুপি, মনিপুরী রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা) পাণিগ্রহণ করে ১২ বৎসর পরে। আমি তো উনবিংশ শতকের কুলীন সম্প্রদায়ের বাবুদের সাথে সাক্ষাৎ মিল পাই।

এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। ছোটবেলায় পুকুরঘাটে মহিলাদের স্নানের সময় কাপড় চুরির যে গল্প আমরা গ্লোরিফায়েড ওয়েতে পড়ে এসেছি তা আসলে ইভ টিজিং ছাড়া কিছু নয়। মহাভারতের বড়ো বড়ো রথী মহারথী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় কেমন এখনকার পাবলিকের মতন ঘাপটি মেরে বসেছিলেন তাও আমাদের অজানা নয়। ভাবছেন এগুলি দুটি, একটি ছোট্ট ব্যতিক্রমী ঘটনা ? এমনটা তো হয়েই থাকে? এর সাথে পার্ক স্ট্রীট কান্ড, মনিপুর, হাথরাস, উন্নাও এমনকি হালফিলের সন্দেশখালির কোনো মিল নেই ? বেশ, চলে আসুন রামায়ণে। রঘুপতি রাম লোক অপবাদের ভয়ে সীতাকে নির্বাসনে পাঠানোর মতন ঘৃণ্য কাজ করলেন।

গর্ভধারীনী স্ত্রী ও গর্ভস্থ্য সন্তানকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রতন্ত্রকে উপরে স্থান দিলেন। এই রাষ্ট্রতন্ত্র আসলে পুরুষ শাসনের আগ্রাসন ছাড়া কিছু নয়। আবার শুর্পনখা গেলেন লক্ষণকে প্রেম নিবেদন করতে আর বদলে খোয়ালেন নিজের নাকটি। মাত্রাতিরিক্ত ভায়োলেন্স চোখে পড়ল কি ?

সেই পুরাকাল হতে অধুনা হিন্দি সিনেমা পর্যন্ত নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেখানো হয়ে চলেছে। নায়ক দুলকি চালে গিয়ে যদি নায়িকার কাপড় ধরে টানই না মারলো, জোর করে একটু আদরই না করলো তবে সে আর কি ম্যাচো হিরো? ধর্ষণ, খুন, যৌন অত্যাচারের কথা বারবার উঠে আসছে টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট গণমাধ্যম গুলিতে। যার প্রভাব শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত নাবালক ও যুবসমাজের উপর অপরিসীম। বাস্তব ও কল্পনার সুক্ষ ফারাক বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। সুস্থ যৌনশিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। বড়োই দুঃখের বিষয় আজও আমাদের সমাজে মনোবিদের পরিচয় "পাগলের ডাক্তার" আর যৌনকর্মীর আরেক নাম "পতিতা"। মুশকিল হলো এতকিছুর নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারো নেই। সবার চাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, হয় শিরচ্ছেদ নয় লিঙ্গচ্ছেদ। সমস্যাটা কোথায় তা নিয়ে খুব কম লোকজনকে মাথা ঘামাতে দেখলাম।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আপদগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাদের ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দিয়েছে আদালত। ভাবলাম বাঁচা গেছে, আপদ বিদায় হয়েছে। কিন্তু আশা নিরাশার দোলাচলে আছি, সত্যিই কি কাল থেকে সব অপরাধ কমে যাবে ?

বিজ্ঞাপনে নারীদেহের ব্যবহার কমবে ? গৃহবধূর উপর নির্যাতন কমবে ? পাঞ্জাব, হরিয়ানায় কন্যাভ্রুণহত্যা কমবে ? "পাত্রী চাই" এর বিজ্ঞাপনে উজ্জল শ্যামবর্ণা আর গৃহকর্মনিপূণা পাত্রীর সংখ্যা কমবে ? এবার থেকে সব অপরাধের বিচার কি তাহলে ফেসবুকের খাপ পঞ্চায়েতে হবে ? আইনব্যবস্থার যে ধর্ষণ রাষ্ট্রীয় মদতে সংঘঠিত হল, তার ভুলুণ্ঠিত সম্মান কি ভাবে পুনরুদ্ধার হবে ?

এর কিছুদিন পরে ....

"বেশ কিছুদিন চলবে আস্ফালন,
ফেসবুক জুড়ে কবিতা, লেখা, ভাষণ,
ঠান্ডাঘরে সোফায় গা এলিয়ে,
কখনও চুপ, কখনও দাঁত কেলিয়ে,
প্লেটে ধোঁয়া ওঠা চিকেন তন্দুরি
সোশাল মিডিয়ায় সংলাপ ঝুরি ঝুরি।
বিখ্যাত কোনো চ্যানেলে রোজ সন্ধ্যাবেলা ,
সবজান্তাদের ঘন্টাখানেক যুক্তি, তর্ক খেলা।"

কয়েকজন বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অনেকক্ষণ এসব আলোচনা চলছিল। এক বন্ধু গ্রুপে একটি স্বল্পবাস পরিহীতা মহিলার ছবি শেয়ার করে বলল, "অনেকক্ষণ ভারী ভারী আলোচনা হয়েছে। নে এবার একটু এনজয় কর সবাই।" সবাই মিলে হেসে উঠল ওরা। আজ সবাই উল্লাসিত, অবশেষে শাস্তি পেয়েছে শয়তানগুলো। সমাজ আবার শুদ্ধ হয়ে গেছে। পৈশাচিক উল্লাসের বাতাবরণ চারিপাশে।

ওদিকে অনেক দুরে ওই চার পাষন্ডর পরিবারের লোকজন শবদাহ করার পরে অস্থি সংগ্রহে ব্যস্ত। ধিকিধিকি জ্বলছে চিতার আগুন, কিছুক্ষণ পরে নিভে যাবে। কবিতার খাতা, মোমবাতিগুলো এখন তুলে রাখা যাবে, অন্তত কিছুদিনের জন্যে তো বটেই ।

সব গুলিয়ে যাচ্ছে ..... তিলতিল করে যে পাপের ভান্ডার আমরা সমাজে সৃষ্টি করেছি, সেই পাপ উপচে পড়েছে আজ। একুশ শতকের পৃথিবী নারীদের আজও সুস্থ সমাজ দিতে পারেনি। মুক্ত দুনিয়া মুক্ত বাণিজ্যের জগতে নারীরা আজও পণ্য।

গত ৮ই মার্চ ছিল বিশ্ব নারী দিবস। প্রতিবছর এই দিনটি এলে অবধারিতভাবে বিভিন্ন ভাষণে, বিভিন্ন পত্রিকার কলামে, বিভিন্ন আলাপ আলোচনায়, বিভিন্ন ঘরোয়া আড্ডায় নারী দিবসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা বলতে শোনা যায়। নারীদিবস আসে, নারীদিবস যায়। আসুন এই বছরের নারীদিবসে কামনা করি, নারীদিবসে "নারী দিবস" না হলেও বিশ্ব চরাচরে নারী প্রতিষ্ঠিত হোক বীরাঙ্গনা ও জ্ঞানদায়িনী রূপে।

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দাহে"

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

ফুলকপির তরকারি, প্রজন্মের ব্যবধান

চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো মৃত্তিকা। প্রায় রোজদিনই এই একই সময়ে সে কাজ থেকে বাড়ী ফেরার ট্রেন ধরে। মজার ব্যাপার হল ট্রেনের সময় নির্দিষ্ট হলেও জানালা দিয়ে সে যখন বাইরে তাকায় বছরের একেক সময়ে প্রকৃতির একেক রকম রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ছুঁয়ে যায় তার সব ইন্দ্রিয়কে। এই তো সপ্তাহ দুয়েক আগে পর্যন্তও বিকেলের এই সময়টাতে পায়ের তলায় মাটি হয়ে থাকত যেন নকশী কাঁথার মাঠ। পড়ন্ত রোদের সোনালী আভায় লাল টুকটুকে নতুন বৌ এর লজ্জার রঙ ছুপিয়ে দিত গাছের পাতা, ঘাসের আগা। সে সব কিছুই আজ এখন আর চোখে পড়ল না মৃত্তিকার। কে যেন অদৃশ্য হাতে আকাশ আর মাটির বুক থেকে রঙের রেশটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। পড়ন্ত বিকেলের মরা আলোয় ধূসর আকাশ এখন বড় বেশী ম্লান। একঝলক নিজের হাতঘড়িটি দেখে নিল সে। মাত্র পাঁচটা বাজে। কিন্তু সে জানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ ঘাট প্রান্তর জুড়ে নেমে আসবে অন্ধকার। সময়টা হল নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। আমেরিকার মধ্যপশ্চিমের রাজ্যগুলোতে এই সময়ে এই রকমই হয়। গোধূলির রঙ মুছে যেতে না যেতেই রাত্রি নেমে আসা মৃত্তিকার ভাল লাগে না একদম। চারপাশের অন্ধকার যেন চেপে বসতে চায় তার মনে। তবে আজকের দিনটি ব্যাতিক্রম। আসলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই মৃত্তিকার মন বেশ প্রফুল্ল।

অনেকদিনের পর তার মা এসেছেন তার কাছে। প্রায় বছর দুই আগে চলে গেছেন তার বাবা। আর সেই থেকেই মৃত্তিকা নানাভাবে মা'কে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছে তার কাছে এসে কিছুদিন থাকার জন্য। মা তার যথেষ্ট স্বনির্ভর। শারীরিক এবং মানসিকভাবেও সক্ষম। তবুও মৃত্তিকার মনে হয়েছিল দীর্ঘ ৫০ বছরের সঙ্গীকে হারিয়ে মা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। মুখে এ বিষয়ে কোন কথা না বললেও একধরনের মানসিক ক্লান্তি যেন তাঁকে ঘিরে ধরছিল। মৃত্তিকা বেশ টের পাচ্ছিল সে কথা। বুঝতে পারছিল বই পড়া, গান শোনা ইত্যাদিতে মা আর তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। তাই দূরভাষে অনেক আলাপ আলোচনা আর কথপকথনের পর মা যখন অবশেষে তার কাছে আসতে রাজী হলেন আহ্লাদে প্রাণ নেচে উঠল তার।

আর সেই আহ্লাদেই বিকেল শেষ হতে না হতেই ঘনিয়ে আসা রাত্রির অন্ধকারেও তার মনে আজ আলোর ফুলঝুরি। মা আছেন — অন্ধকার বাড়ীতে একলা ঢুকে আলো জ্বালাতে হবে না তাকে। সাধারণত এই সময়টা মা বসার ঘরের সোফার উপরে বসে বই পড়েন। এখনও বই পড়ার ভারী ঝোঁক মায়ের। মৃত্তিকা ঘরে ঢুকলেই বলে ওঠেন, 'আগে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় জামা বদলে নাও। চা করেছি। তুমি এস। একসঙ্গে চা খাব।' রোজ একই সংলাপ। কিন্তু এই কথা কয়টি শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে তার প্রাণ। মনে হয় সত্যি সত্যি ঘরে ফিরেছে সে। ছোট্টবেলার মতো আজও তাই ছুটতে ছুটতে উপরে গিয়ে হাত ধুয়ে, জামা বদলে সোজা চলে আসে খাওয়ার টেবিলে। ধোঁয়া ওঠা চা এর পেয়ালা হাতে নিয়ে মা মেয়ে মুখোমুখি বসে। তারপর দুজনের সারাদিনের জমা করা টুকরো কথা, টুকরো হাসি — বাইরের অন্ধকারের দিকে মন দেওয়ার সুযোগ কই তখন ?

আজ কিন্তু বাড়ীর পরিবেশটা একটু অন্যরকম লাগল মৃত্তিকার। বাড়ীতে পা দিয়েই সে লক্ষ্য করল মায়ের মুখ থমথমে। চোখ ঈষৎ ফোলা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মৃত্তিকা, 'মা, তোমার শরীর খারাপ নাকি ?'

'না শরীর ঠিকই আছে।'

'তাহলে ?'

'ঐ বইটা শেষ করলাম আজ। পড়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রে !'

গত কয়েকদিন যাবৎ মা গভীর অভিনিবেশ সহকারে এক খ্যাতনামা বাঙালী লেখকের জীবন অবলম্বনে রচিত একটি উপন্যাস পড়ছিলেন। সেই লেখক তাঁর কর্তব্যপরায়ণা, সুন্দরী, গুণবতী স্ত্রীকে ছেড়ে প্রৌঢ় বয়সে এক নতুন সঙ্গিনীর সংস্পর্শে আসেন। এই ঘটনাটি যে মায়ের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হল না মৃত্তিকার। সৃষ্টিশীল মানুষদের ভাললাগা, ভালবাসা, প্রেম এসব যে সাধারণ মানুষের অনুভূতির নিরিখে বিচার করা ঠিক নয় একথা মাকে কোনমতেই বোঝাতে পারে না মৃত্তিকা। 'বিয়ে' নামক প্রথাটি যে সমাজবিজ্ঞানীদের মতে তুলনামূলক ভাবে অ-সনাতন একথা মানতে মা নারাজ। তাই উপন্যাসে পড়া নিজের অতি প্রিয় লেখকের জীবনের এই দিকটি জানতে পেরে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। এ কি রকম নৈতিকতাবোধহীন জীবন যাপন ? মৃত্তিকা অনেক চেষ্টা করেও এ বিষয়ে তার আলোকপ্রাপ্তা মায়ের চিন্তাভাবনা প্রভাবিত করতে পারে না। প্রজন্মের তফাৎ ? হবে হয় তো।

'ও! অপর্ণার দুঃখে মা জননী আমার শোকাকুলা।' অপর্ণা উপন্যাস বর্ণিত লেখকের প্রথমা স্ত্রী।

'ঠাট্টা করিস না তো মিতু সব বিষয়ে। যতই তুই আমাকে বোঝা এ কাজটা লেখক মোটেই ভাল করেন নি। নিজের অমন গুণবতী বউ ছেড়ে মাঝ বয়সে আবার একটা বিয়ে করা ! ভাল ওরকম অনেক মানুষের অনেককে লাগতেই পারে। তাই বলে তাকে জীবনসঙ্গিনী করতে হবে ?'

'তা কি করা যাবে মা ? সম্পর্ক তো সব সময় সরলরেখায় চলে না। নিজের অনুভূতি অস্বীকার করে চললেও তো নিজের সঙ্গে ছলনা করা হয়, তাই না ? আমরা সবাই যেমন আমাদের কাছের লোকের কাছে নানাভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তেমনি প্রত্যেক মানুষের নিজের কাছেও একটা প্রতিশ্রুতি আছে। সেটা অগ্রাহ্য করাও তো একরকমের অসততা।'

'কি জানি, তোমার সব যুক্তিগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। থাক এখন এ প্রসঙ্গ।'

মৃত্তিকা জানে এ মাএর অভিমানের কথা — তাঁর আর মেয়ের মূল্যবোধে যে বিরোধ হচ্ছে এটা মেনে নিতে তাঁর অসুবিধে হওয়ারই কথা। তাই আর বাক্যব্যয় না করে মাকে নিজের অনুভূতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ছেড়ে দেয় মৃত্তিকা। রাতের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাপনা শুরু করতে গিয়ে একটু থমকে যায় সে। মায়ের জামাই, সুব্রত, কি আজ রাত্রে বাড়ী ফিরবে ? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অফিসের কাজে শহরের বাইরে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে সুব্রতকে। তার মনে পড়ল গতকাল রাতে ঘুমের মধ্যে সে যেন একবার সুব্রতর গলা পেয়েছিল। পাশে বিছানায় তার আবছা উপস্থিতিও মনে পড়ছে। তারপরে আবার ভোর রাতে বাথরুমে কলের জলের আওয়াজ, মাইক্রোওয়েভের শব্দ আর গ্যারেজের দরজার ওঠাপড়ার ঘর্ঘর — সুব্রত যে পরের সফরে বেরিয়ে গেল তৈরী হয়ে এ কথা জানতে সে পেরেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলা আর হয়ে ওঠে নি। সারাদিন ঘরে আর বাইরে নানাবিধ কর্তব্যকর্ম সেরে মৃত্তিকা যখন শুতে যায় ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ে শরীর। ভোরের এ্যালার্ম না বেজে ওঠা পর্যন্ত ঘুম ভাঙে না তার।

কিন্তু এখন তার মনটা খচখচ করে উঠল। মানুষটা কবে কখন ফিরবে, কোথা থেকেই বা ফিরবে কিছুই জানা হল না। ঠিক তখনই তার মাও প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মেয়ে, সুব্রত এরা সব কে কখন ফিরবে বাড়ীতে ?' 'মেয়ে ফিরে আসবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে। আজ বুধবার, তার ফ্ল্যুট লেসন আছে মা। ভুলে গেছ বুঝি ?' তাড়াতাড়ি করে অনেক কথা বলে ওঠে মৃত্তিকা। 'আর সুব্রত ?' তার ঠোঁটের ডগায় চলে আসা উত্তরটি মাকে দিতে সে সাহস করল না। মনে ভাবল মেয়ে বাড়ী এলেই তার কাছে খোঁজ নিয়ে সুব্রতর ফেরা দিনক্ষণ জেনে নেবে। সুব্রত যেখানেই থাক বোস্টন বা পোর্টল্যান্ড — মেয়ের নির্দেশ ফ্লাইট ল্যান্ড করলেই যেন তাকে টেক্সট করে দেয় বাবা। মৃত্তিকাকে নিরুত্তর দেখে মা আবারও বললেন, 'কি হল ? চুপ করে গেলে যে ? আমার জিজ্ঞাসা করার কারণ হল সকলের ফেরার সময় বুঝে আমি পরোটাগুলো ভাজতে শুরু করব। ময়দা মাখাই আছে। ওরা ফেরার খানিকটা আগে বোলো আমাকে তাহলে। ফ্রিজ থেকে বের করে রাখব।' মৃত্তিকা ঘুণাক্ষরেও জানত না যে আজই মা তাঁর জামাইয়ের প্রিয় পরোটা আর আলুচচ্চড়ি বানানর পরিকল্পনা করেছেন। এবারে সে বলতে বাধ্য হল, 'ঠিক জানি না মা সুব্রত কখন ফিরবে আজ বা আদৌ ফিরবে কিনা !' মা এর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কৈফিয়তের ভঙ্গিতে সে বলে উঠল, 'আসলে

তোমার জামাই কাল অনেক রাত্রে ফিরেছিল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম খুব। তাই ঘুম থেকে জেগে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় নি। চিন্তা করোনা। তোমার নাতনী বাড়ী ফিরলেই তার বাবা কখন ফিরবে জানা যাবে। আমিও ফোন করেছিলাম সুব্রতকে। কিন্তু কথা হয় নি।' 'বেশ! আসলে তোমাদের সংসারের ধরনধারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না আর। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই অনেক বয়েস হয়ে গেছে।' মায়ের শান্ত ভঙ্গীতে একটু যেন চিন্তায় পড়ল মৃত্তিকা। মনে পড়ে গেল তার নিজের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দীপনাময় দিনগুলোর কথা। তখন প্রায়ই মা এর সঙ্গে তুমুল তর্ক হত তার সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, সাহিত্য, গান প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে। নানা বিষয় পড়াশোনার অভ্যাস মা'র চিরদিনই। সেইসব জ্ঞান হাতিয়ার করে মা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়তেন মেয়ের সঙ্গে। মা এর এইরকম উদাসীন নিস্পৃহ ভাব আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না মৃত্তিকার। মা এর বয়স কি তাহলে সত্যিই অনেকটা বেড়ে গেছে নাকি তার অজান্তে?

ভাবতে ভাবতে রাতের রান্না সেরে ফেলল সে। ইতিমধ্যে তার কন্যা ফিরে এসেছে বাজনা বাদ্যির প্রশিক্ষণ শেষ করে। তার কাছে মৃত্তিকা খবর পেল সুব্রত গেছে আটলান্টায়। ফিরবে আগামীকাল রাত্রে। পরোটা আলুচচ্চড়ির মেনু তাই সে রাতে মুলতুবিই রইল। চটপট ডাল, আলু ফুলকপির তরকারি আর ঢেঁড়সভাজা বানিয়ে মা আর মেয়েকে খেতে ডাকল মৃত্তিকা। ভাগ্যক্রমে খেতে ডাকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেয়ে এসেও পড়ল খাওয়ার টেবিলে। সাধারণত মা খেতে ডাকলেও সে নিজের লেখাপড়ার কাজ একটা জায়গা পর্যন্ত না শেষ করে খেতে আসে না। বেশীর ভাগ দিনই তাই মৃত্তিকা মেয়ের ভাগের খাবারটা তুলে রেখে নিজে খেয়ে নেয়। প্রথম প্রথম তার মা আপত্তি করতেন খুব, 'এ কি কাণ্ড! বাচ্চা মেয়ে পড়ে রইল না খেয়ে আর আমরা বাড়ীশুদ্ধু লোক সব খেয়ে নেব?' এখন তার বকুনি খেয়ে মা আর আপত্তি করেন না। তবে নাতনী যে দিন গুলোতে একসঙ্গে খেতে বসে সেইসব দিনে বড় আনন্দিত হন তিনি।

আজ কিন্তু মা এর মনটা এখনও যেন কেমন ভারাক্রান্ত। মা অবসরপ্রাপ্তা শিক্ষিকা। দেশে তাঁর নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সেই জগতে আছেন তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীরা, বন্ধুবান্ধবী, বই, গান, খবরের কাগজ। বাবা মারা যাওয়ার পরে এই সব কিছুই মা এর সঙ্গী এখন। শুধু মেয়ের অনুরোধেই হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে নিজের চেনা পরিচিত জায়গা ছেড়ে মা বিদেশে এসেছেন। মেয়ের সংসারের ধরনধারণ সবসময় পছন্দ না হলেও মানিয়েও নিয়েছেন বেশ সহজেই। মৃত্তিকা তাই সর্বান্তঃকরণে চায় যাতে মা আনন্দে থাকেন। তাঁকে কিছুটা সহজ করার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, 'আজ রান্না কেমন হয়েছে মা? তুমি তো ফুলকপি ভালবাস। তরকারির স্বাদ ঠিক আছে?' মা কিছু নীরস্বরে বললেন, 'ভালই হয়েছে তরকারি। তবে ঘর সংসারের কাজে সেভাবে মন দেওয়ার সময় কোথায় তোমার? দিনরাতই খালি দৌড়ে বেড়াচ্ছ। আমাকে বললেই পারতে আগে। সব্জিগুলো কেটে রাখতাম।' এবারে মৃত্তিকা আহত হল। নিজের চাকরি, পনের বছরের মেয়ের নানা প্রয়োজন আর সংসারের খুঁটিনাটি নানবিধ দাবী মেটাতে মেটাতে তার দিনের শতকরা আশিভাগ সময়ই চলে যায়। দৌড়ে বেড়ান? সে ও তো তার নিজের শখে নয়। বয়স হলে বোধহয় সকলেই একটু অবুঝ হয়ে পড়ে। তবে সেও তার প্রতি মা'র প্রচ্ছন্ন অভিমান টের পায়। চিরকালই একা থাকা তাঁর অপছন্দ। বিদেশে মেয়ের বাড়ী বেড়াতে এসেও যে সারা দিনটাই তাঁকে সঙ্গীবিহীন হয়ে কাটাতে হয় এটা তাঁর পছন্দ নয়। পছন্দ তো মৃত্তিকারও নয়। কিন্তু উপায় কি? অভিবাসীদের জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্রটাই তো সময়ের পিছনে ছুটে বেড়ানর এক মানচিত্র। মাকে যে সে সঙ্গ দেবে মা যতটা চান তার অবকাশ কই? ম্লানকণ্ঠে সে বলে, 'কেন মা? তরকারি কাটার কি দোষ হল?'

'এই যে একটা আলু বা কপির টুকরোর সঙ্গে অন্যটার আকৃতি প্রকৃতির কোন মিল নেই। স্বীকার কর বা না কর তরকারির স্বাদ অনেকটাই নির্ভর করে কুটনোর উপর।'

খাওয়ার টেবিলের উপর সুদৃশ্য serving bowl এ ধোঁয়া ওঠা ফুলকপির তরকারি। তার কমলা হলুদ ঝোল থেকে ভেসে আসছে জিরে লঙ্কা ভাজার সুবাস। মৃত্তিকার মেয়ে মা এর বিমর্ষতা লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'Well, how does it make any difference? It still tastes the same. Ma has a lot of other things to do than worrying about shape and size of potatoes in cauliflower curry.'

সে স্বভাবত মৃদুভাষী। তার এই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায় মৃত্তিকা অবাক হল বেশ। মা এর মন মেজাজ ভাল না থাকার কারণ সে বোঝে। কিন্তু মেয়ের হল কি ? শরীর খারাপ ? মন খারাপ ? হোম ওয়ার্কের চাপ ? গ্রুপ প্রজেক্টে সহপাঠীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় বিরক্তি ? না কি নিজের মা এর প্রতি মমত্ববোধ ? তারই মতো ? ঠিক বুঝতে পারে না। তার মেয়ে এমনিতে চুপচাপ। নিজের আবেগ অনুভূতি নিজের কাছে রাখতে চায়। তা নিয়ে আলাপ আলোচনা সে পছন্দ করে না। মৃত্তিকা তাই সরাসরি কোন প্রশ্ন করে না মেয়েকে। শুধু নিজের মাকে আলগা হাতে জড়িয়ে নেয় মুহূর্তের জন্য। সে নিজে যেমন তার মেয়ের আচরণে বিভ্রান্ত মা'ও হয়তো তার চিন্তাভাবনা, সংসার চালানর রীতিনীতিতে বিভ্রান্ত। আর সেটাই নিশ্চয়ই তাঁর পূঞ্জীভূত অভিমানের কারণ। ফুলকপির তরকারিটা উপলক্ষ্য মাত্র। মা এর প্রতি অকারণ মমত্বে তার মন ভরে ওঠে।

টেবিল ঘিরে তিনদিকের তিনটি চেয়ারে বসে চুপচাপ খাওয়া দাওয়া শুরু করল তিন প্রজন্মের তিনটি মহিলা। কারও মুখে কোন কথা নেই। একজনের ভাবনা টের পাচ্ছে না অন্যে। হয়তো বা আন্দাজ করে নিচ্ছে কিছুটা। বাইরে আসন্ন শীতের পূর্বাভাষস্বরূপ ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে ততক্ষণে। নিস্তব্ধ খাওয়ার টেবিলে শুধু হাতা চামচের ঠুংঠাং। দেওয়াল ঘড়িতে বেজে উঠল সন্ধ্যে আটটার ঘন্টা। বাড়ীর কাছের স্টেশন দিয়ে ট্রেন যাওয়ার আওয়াজ বড় স্পষ্ট আজ। সময় এগিয়ে চলেছে তার নিজের গতিতে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে কি বেড়ে চলেছে প্রজন্মের ব্যবধানও ?

তাপস কুমার রায়

দাড়িওয়ালা রানী

এক প্রাচীন নারীর গল্প বলি। এক প্রাচীন রানীর গল্প। যে নারী মারা গিয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫৮ র পনেরো জানুয়ারী। আর মৃত্যুর পর মুছে গিয়েছিল ইতিহাসের পাতা থেকে। মানে মুছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুছে ছিল কে? না তারই সৎ ছেলে, তারই উত্তরসূরী। মাত্র কয়েক বছর আগে ইতিহাস তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল। আর তার মৃত্যুর পর থেকে পার হয়ে যাওয়া প্রায় পয়ঁত্রিশ হাজার বছর ধরে দুখিনী মায়ের মতো ইতিহাস তাকে লুকিয়ে রেখেছিল এক অন্ধকার আঁচলের নিচে। এ গল্প সেই সময়কার মিশর দেশকে নিয়ে যে সময় মিশরের ফারাওদের সভ্যতা জাঁকিয়ে বসেছে। জন্মের পর প্রায় দু'হাজার বছর পেরিয়ে ফারাও সভ্যতা তখন তার মাঝবয়সে।

রাজা নার্মার মারা যাওয়ার প্রায় দুই হাজার বছর পরের এই গল্প। এই রাজা নার্মারই মিশরের প্রথম ফারাও। দক্ষিণ ও উত্তর মিশর বা আপার ও লোয়ার নাইল এর পার্শ্ববর্তী সবুজ ও তার পাশের ধূ ধূ শুয়ে থাকা লালচে বালির মিশর কে একসাথে জয় করে ফারাও উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেছিল রাজা নার্মার। সেই নার্মার মরে ভুত হয়ে গেছেন। তারপর আরও একশোজন এসে ফারাও হয়ে রাজত্ব করে চলে গেছেন। এই গল্প সেই সময়কার।

মিশরের তখনকার রাজা থুটমোস বা ঠোটমোস। রাজা মশাই ভালোই। ছোটোখাটো যুদ্ধ জয় করেন আর রীডের ঘরে বসে নীল আকাশ দেখেন। কিন্তু রাজামশাইয়ের দুঃখ ভারী। দু দুটো ছেলে মারা গেলো। একটি মেয়েও। বেঁচে আছে শুধু রাজামশাই এর প্রথম সন্তান। নাম তার হাটসেপসুট। শুরু করা যাক এই হাটসেপসুটের বাবা প্রথম ঠোটমোস এর রাজা হওয়া নিয়ে।

রাজা প্রথম আমনহোটেপ এর ছেলে প্রথম ঠোটমোস। ফারাওয়ার ছেলে হলেই ফারাও হওয়া যায়না। বাবা ফারাও হলেই চলবেনা, মা'কেও ফারাও এর মেয়ে হতে হবে। ঠোটমোসের মা ফারাও এর মেয়ে ছিলেন না। কিন্তু আমনহোটেপ এর প্রধান রাজমহিষী যিনি তার ছেলে সন্তানেরা বেঁচে নেই। এই প্রধান রানী কিন্তু আবার আমনহোটেপের বোনও বটে। কারণ একটাই। ফারাও এর মেয়ে ছাড়া প্রধান রানী হওয়া যায়না। যাক ফিরে আসি ঠোটমোসের কথায়। প্রধান রানীর ছেলে নেই। তাই ঠোটমোসের রাজা হওয়া উচিৎ। তবে রাজা হতে গেলে তাকে বিয়ে করতে হবে ফারাওয়ার মেয়েকে। কিন্তু আমনহোটেপের যে মেয়ে নাই। অতএব ঠোটমোস কে ফারাও হতে গিয়ে বিয়ে করতে হলো রাজকুমারী আমোস কে। কে এই রাজকুমারী আমোস ? না সে হলো আমনহোটেপ ১ এর বোন। মানে ঠোটমোস এর পিসি।

ঠোটমোসের গল্প এ কাহিনীর বিষয় নয়। এ কাহিনীর নায়িকা ঠোটমোস ও আমসের চার পুত্রকন্যার সবচেয়ে বড় কন্যা রাজকুমারী হাটসেপসুট। নীলনদে জল আসে আর যায়। মাঝে মাঝেই কূল ভাসায়। কালের নিয়মে রাজপুরীতে জন্ম মৃত্যুও হয়। রাজপুরী অবশ্য রীডের ঘর মাটি লেপা। খেজুরের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদ। ছাদের ফাঁক ফোকর দিয়ে নীল চাঁদের জ্যোৎস্না আসে। নীল নদের মন উদাস ঠান্ডা হাওয়াও।

দুই বোন তিন ভাইয়ের কেউই বেঁচে থাকলোনা হাটসেপসুটের। হাটসেপসুটের বাবা ফারাও ঠোটমোস ১ পড়লেন মহা বিপাকে। তবে যে মেয়েটা বেঁচে আছে সে কিন্তু খুব একটা ফেলনা নয়। বাবার প্রথম সন্তান। বড় পছন্দের কন্যা। পড়াশোনায় বেশ। পবিত্র আমুন এর মন্দিরে রোজ যাতায়াত করে। এমনকি করনাক মন্দিরের আমুনের উপাসনাগৃহে ঢুকে পুরোহিত শেষেঙ্কের সাথেও তর্ক করে আসতে সক্ষম। ঘোড়ায় চড়তে জানে আর দেবী হাথরের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। বাবা যখন রথে করে বেরোয় মেয়েও যায় সাথে সাথে। মেয়ের ইচ্ছা বাবার পর সেই হয় ফারাও। বাবারও ইচ্ছা তাঁর পর মেয়েই হোক ফারাও। কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ নয় শেষেঙ্কের। আমুনের মন্দিরের যত পুরোহিত আছে মহাপুরোহিত শেষেঙ্কের নিচে, তাদের সকলকে ভিতর ভিতর বলে রেখেছে যে মেয়ে ফারাও কদাচ না। মেয়ে ফারাও মানে সে যুদ্ধে যাবেনা। যুদ্ধে না গেলে লুঠ হবেনা। লুঠের বড় অংশ আসবেনা আমুনের মন্দিরে। পুরোহিতের নিজের সিন্দুক ফাঁকা রয়ে যাবে। রাজার মনে গোপন ইচ্ছা থাকলেও তা প্রকট হয়না আমুন পুরোহিতের কথা ভেবে। জনগন রাজা কে দেবতা মানলেও রাজার সাথে তাদের দেখা হয় কই। কিন্তু আমুনের মন্দিরের পবিত্র পুরোহিত তাদের পিতা সমান। নীলনদের জল কখন ফুলে উঠবে আর কখন তাদের ঘর ভাসাবে তা একমাত্র তাদের বলতে পারে অমুনের পুরোহিত। শীতের শেষে যখন শস্যদানা কম পড়ে যায়, ছেলে বুড়ো নিয়ে যখন ক্ষিদে পায় তখন এই আমুনের ভান্ডার থেকেই পবিত্র চাল জব পায় তারা। আমুন বার্তা পাঠায় জনগণের কাছে তার উপাসকের মাধ্যমে। পুরোহিত যদি বলে রাজা বদলাবার সময় হয়েছে তাহলে জনগনও তা বিশ্বাস করে।

প্রথম ঠোটমোস এর আরেক পুত্র আছে অবশ্য। দ্বিতীয় ঠোটমোস, রানী আমস এর এক পরিচারিকার গর্ভে। কিন্তু তাকে রাজা হতে গেলে আবার সেই এক গেরো। বিয়ে করতে হবে আমস এর কোনো মেয়ের সাথে। একমাত্র জীবিত কন্যা হাটসেপসুট। দ্বিতীয় ঠোটমোস এর থেকে প্রায় দশ বছরের বড় রাজকুমারী হাটসেপসুট। অগত্যা রাজা প্রথম ঠোটমোস একদিন মৃগয়ায় গিয়ে তার আদরের মেয়ের কাছে তারই সৎ ভাইকে বিয়ে করার কথা বললেন। রাজী হলো হাটসেপসুট তার নিতান্ত বালক ভাইয়ের রানী হতে। মনে মনে ভাবলো মেয়ে – যাক রাজকুমারী থেকে রানী তো হওয়া গেলো।

এর কয়েকদিন পর নদীর জল যখন ফুলতে শুরু করেছে, বড় বড় কুমীর গুলো ভেসে উঠে জল ছেড়ে মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ছে, মারা গেলেন প্রথম ঠোটমোস। আর হাটসেপসুটকে বিয়ে করে সিংহাসনে বসলেন দিদির নেওটা ভাই দ্বিতীয় ঠোটমোস। অথচ রাজত্বে তার মন নেই। তার এক আমত্য শেষেন্মুট, তার থেকে বয়সে একটু বড়, তার কাঁধে প্রায় রাজত্বভার চাপিয়ে দিয়ে তার দিদি বা নতুন বউয়ের সাথে খেলাধুলো করতে বেশি উৎসাহ ঠোটমোস এর। এই শেষেন্মুট আবার জ্ঞানী গুণী বিচক্ষণ ব্যক্তি। মিশরের ইতিহাসে যে কজন স্থপতির নাম পাওয়া যায় এ তাদের মধ্যে একজন। অর্থনীতির আট ঘাটও তার জানা। রানী হাটসেপসুটের প্রতি তার অগাধ টান। ভরা চাঁদ যেমন নীল নদের জলকে টেনে ধরে, জোয়ার আসে, হাটসেপসুট কে দেখলে ওরকমটা হয় শেষেন্মুটের।

আমুনের পুরোহিত তরুণ রাজাকে চোখ রাঙাতে পারলেও তার স্ত্রী হাটসেপসুট বা শেষেন্মুটকে ঠিক বাগ মানাতে পারেনা। হাটসেপসুট ঠিক মেনে নিতে পারেনা ফারাও এর ওপর পুরোহিতের দাদাগিরি আর শেষেন্মুটের কাছে হাটসেপসুট ছাড়া আর কারোর কোনো দরকার নেই। অমন সুন্দর নারী সে আগে দেখেনি। যখন হেঁটে আসে তার মনে হয় যেনো নদীর ধার ধরে ধীর পায়ে সারস হেঁটে আসছে। রানীরও প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা আছে। টান দুপক্ষেই। আড়চোখে তাকায় শেষেন্মুট এর পানে। ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে প্রেম। সমবয়সী সুন্দরী দৃঢ়চেতা রানী হাটসেপসুট আর তার বুদ্ধিমান জ্ঞানী গুণী মন্ত্রী শেষেন্মুট।

ইতিহাস কিন্তু প্রেমিকের অভাব রাখেনা। যত না ঘাতক তৈরী করেছে তার চেয়ে বেশি প্রেমিকের জন্ম দিয়েছে। মানুষও তাই আজও বেঁচে আছে। আরও একজন গোপনে গোপনে রানীর আকর্ষণে মুগ্ধ। করনাক মন্দিরের এক তরুণ পুরোহিত হাপুসেনেব। রানী যখন করনাকের বিশাল পরিখাটায় অবগাহনে নামেন, সূর্যের ঢলে পরা রোদে ঢল নামা দীঘল চুলে তিনি ভেজা পায়ে উঠে পালকিতে বসেন, করনাকের ছাদের উঁচু অলিন্দে দাঁড়িয়ে তরুণ পুরোহিত

হাপুসেনেব তা দেখেন। তার ফুটে ওঠা যৌবন ছটা নিয়ে রানী পা গুটিয়ে পালকিতে বসতে বসতে তা দেখেন আর হাসেন। পুরুষ মানুষের দৃষ্টি চিনতে তার ভুল হয়না।

বিয়ের ও রাজা হওয়ার আট বছরের মাথায় মারা যান দ্বিতীয় ঠোটমোস। সন্তান বলতে হাটসেপসুটের কোলে এক মিষ্টি ছ'বছরের মেয়ে আর তার উপপত্নী ইসিসের ঘরে এক নাবালক তৃতীয় ঠোটমোস। এই হয়তো প্রথমবার বা হয়তো হাতে গোনা কয়েকটি উদাহরণের এটি একটি, রাজা হলো ঠোটমোস ৩। একে তো রাজার উপপত্নীর ছেলে তারপর নাবালাক, রাজার মেয়ে বা হাটসেপসুটের মেয়ে তার সাথে নাবালক বালকের বিয়ে দিতে রাজী নন হাটসেপ। রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে না হওয়া সত্বেও করনাকের পুরোহিতের কথায় ঠোটমোস ৩ কে সিংহাসনে বসাতে রাজী হয়ে গেলো সৎ মা হাটসেপসুট। কিন্তু মেয়ের সাথে বিয়ে দিলো না কেনো ? সময় দিয়েছিল সে উত্তর। নাবালক ফারাওয়ের দেখভাল করা ও তার হয়ে রাজ্য চালনাতে রাজী হল হাটসেপসুট। রাজী হল করনাকের পুরোহিত। রাজী না হয়ে অবশ্য উপায় ছিলনা দুজনেরই। কারণ ঠোটমোস ৩ নিতান্তই নাবালক ও ফারাও এর প্রধানা মহিষীর সন্তান বলতে একমাত্র হাটসেপসুটের মেয়ে। হয় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ঠোটমোস কে রাজা বানাও নয়তো বিয়ে না দিয়েই ফারাও হিসাবে মেনে নাও। কিন্তু রানীকে ফারাও হতে দেওয়া যাবেনা কারণ ফারাও এর ছেলে আছে। হোক না তার মা রানীর পরিচারিকা।

রাজা হলো তৃতীয় ঠোটমোস। প্রথম দু'বছর তার হয়ে তার নামে রাজত্ব করেছিলো হাটসেপ। দু'বছর পর করনাকের মন্দিরে প্রধান পুরোহিত হিসাবে বসানো হলো হাটসেপের পছন্দের হাপুসেনেবকে। মনে আছে ? যে ছেলেটা লুকিয়ে লুকিয়ে রানীর স্নান দেখতো। ব্যাস মিশরের ভাগ্য চক্র ঘুরতে থাকলো। শক্তিশালী ফারাও হিসাবে নিজেকে তৈরী করার টোপ দিয়ে আদরের বালক ঠোটমোস কে মিশরের নিচে নুবিয়ায় পাঠানো হলো যুদ্ধের রক্তাক্ত জমিতে। বলা হলো ফারাও হিসাবে তৈরী হতে গেলে যুদ্ধের রক্ত মাখা আবশ্যক। মনে মনে আশা ছিলো হয়তো সে আর ফিরে আসবেনা নুবিয়ার কালো বধ্য জমি থেকে।

তারপর অন্তঃপুরে শেষেন্মুট গড়িয়ে দিলো রানীকে এক নকল দাড়ি । সেই দাড়ি পরে বাইরের প্রজার কাছে রানী রাজা সাজলো রাতারাতি। মিশরের সাধারণ মানুষ তাদের রাজা বা ফারাও কে সচরাচর দেখতে পায়না। দেখা হলেও হয় অনেক দূর থেকে। ফারাও মনে হলে তাদের সামনে ভাসে পাথরে খোদাই করা মূর্তিগুলো। আমাদের আজকের জনসংযোগ বা মিডিয়ার বাড়াবাড়ি তখন কোথায় ? চার হাজার বছরের আগের গল্পে মহিলা পুরুষ বেশে পুরুষ সেজে থাকলে মানুষ তাকে পুরুষই ভাবে। ফারাও মানে তাদের রক্ষাকর্তা কে দুর্বল মনে হয়না। ইতিহাসের পাতায় বড় বড় স্ট্যাচু বা মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা হলো রাজারূপী রানীর সেই মূর্তি। পরবর্তী কাল ভুলে গেলো রানী হাটসেপ আসলে মহিলা ফারাও। হ্যাঁ ফারাও। কারণ শেষেঙ্কের মৃত্যুর পর ঠোটমোস কে যুদ্ধে পাঠিয়ে হাপুসেনেবের সাহায্যে বিধবা হওয়ার দু'বছরের মাথায় ফারাও হিসাবে সিংহাসনে বসলো রানী হাটসেপসুট। ইতিহাসের গোড়ার দিককার হাতে গোনা মহিলা রাজাদের একজন। প্রাচীন মিশরের দ্বিতীয় বারের মতো মহিলা ফারাও হল। এর আগে হয়েছিল নেবেক্ষফরু মাত্র কয়েক বছরের জন্যে। শেষেন্মুট আরও একটা কাজ করল। যেখানে যেখানে মন্দির তৈরী হতে লাগলো সেখানে সেখানে খোদাই করতে লাগল পবিত্র গাভী হাথরের স্তন থেকে দুধ পান করছে পুরুষরূপী হাটসেপসুট। মানুষের মনে ধারণা তৈরী হল অমুনের পুত্রী হাটসেপসুটকে এসে প্রজননের দেবী হাথর দুধ খাইয়ে যাচ্ছে। ভগবান বা দেবতার সাথে একবার নিজেদের এক করে ফেলতে পারলে ফারাওদের দিকে কেউ আঙ্গুল তোলার সাহস করেনা।

হাটসেপসুট রাজত্ব করল দীর্ঘ ষোলো বছর। বিশেষ যুদ্ধ বা লুঠতরাজে যায়নি মিশর তার সময়ে। ঠিক এই ভয়টাই পেয়েছিল রানীর থুড়ি রাজার সৈন্যরা। উল্টে বড় বড় মন্দির আর স্মারকস্তম্ভ (ওবেলিস্ক) বানানোতে ব্যস্ত ছিল মিশরের রানী। পুরুষ বেশ নিলেও নারীর মন থেকে মাতৃত্ব কে মুছে ফেলতে পারেনি হাটসেপসুট। প্রজারা সন্তানসম। নীলনদের পাড়ে চাষের ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল তার আমলে। তৈরী করেছিল নৌসেনা। সুমের মেসোপোটেমিয়া আফ্রিকার অন্য দেশ – বাণিজ্য বেড়েছিল কয়েকগুণ। সবচেয়ে বেশি সোনা এসেছিল সেসময় মিশরে। অর্থনৈতিক উন্নতিও যথেষ্ট।

শান্তি নেমে এসেছিল মানুষের মনে। শুধু শান্তি পায়নি যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের দল। যুদ্ধ বন্ধ মানে লুঠতরাজ বন্ধ। মহিলা ফারাও বড়ই নরম মনের। ফারাও হওয়ার অযোগ্য। যুগ যুগ ধরে কেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা লোপ পেতে বসেছে। এই ভেবে তারা মনে মনে বিদ্রোহ করে উঠল। ঠোটমোস ৩ যুদ্ধে মারা যায়নি। উল্টে তাকে এই যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা আরও শক্ত সমর্থ করে তৈরী করল তারপর কানে গরল ঢেলে দিল বলল তোমার সৎ মা তোমার রাজ্য নিয়ে নিচ্ছে আর তোমায় মারার চেষ্টা করছে। শেষেন্মুটের সাথে রাজা (রানী নয় আর) হাটসেপসুটের তখন আবেগজড়িত সম্পর্ক। হাটসেপসুটের উদ্দেশ্যে বিশাল মন্দির বানাচ্ছে তখন শেষেন্মুট বর্তমানের দের-এল-বাহরি বলে মরুভূমির পাশে এক পাহাড়ের পাদদেশে পাথুরে গুহার ভিতর। দেখার মতো সেই মন্দির। পরবর্তী কালে এক মুঘল সম্রাট এরকমই এক তাজমহল বানাবে তার বেগম সাহেবার জন্যে। সেখানে মন্দিরের দেখাশোনা করতে গিয়ে প্রায়ই হাটসেপসুট কে নাকি স্ত্রী বেশে দেখা যায় শেষেন্মুটের খুব কাছাকাছি। নাকি মরুভূমির মরীচিকার মতো মিশরের মানুষের কল্পনা এসব। নাকি সেনাপতিদের চক্রান্ত। ব্যাস, রাজা হাটসেপসুটের সাজানো বাগান শুকিয়ে আসতে লাগলো।

শীত এসে পড়েছে তখন মিশরের আনাচে কানাচে। সোনালী বালি তখন শীতের নরম আমুনের প্রভাবে গোলাপি আভা মেখেছে। হাটসেপসুটের গর্ভে দানা দানা সুখ জন্ম নিচ্ছে। বিকেলের মৃদু হাওয়ায় এরকমই একদিন খবর এলো হাটসেপসুটের কানে যে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শেষেন্মুট উধাও। খোঁজ খোঁজ খোঁজ; না, তার খোঁজ মেলেনি আর। ব্যথাকাতর হাটসেপসুট তখন বেশ বুঝতে পারছে তার দিন ঘনিয়ে আসছে। শেষ চেষ্টা করে ডুবন্ত নাবিকের শেষ আশ্রয় হিসাবে হাপুসেনেব কে আঁকড়ে ধরতে চাইলো রানী। কিন্তু ততদিনে দেরী হয়ে গেছে। ঠোটমোস ৩ ফিরে এসেছে শক্ত সমর্থ তরুণ রাজা হয়ে। একদিন করনাকের মন্দিরের পথে স্নান সেরে ফেরৎ আসার সময় পালকি থেকে পড়ে মৃত্যু হলো হাটসেপসুটের। নাকি ফেলে দেওয়া হল তাকে। ইতিহাস জানে সব কথা কিন্তু পুরোটা বলেনা। কবিরা কল্পনা করে ইতিহাস লেখে না।

রাজা হয়েই ঠোটমোস ভেঙ্গে ফেলল পুরনো সময়ের সব নাম আর নিশান। ইতিহাসে পাতা থেকে মুছে দেওয়া হল হাটসেপসুটের নাম। যে দুটো ওবেলিস্ক হাটসেপসুট তৈরী করেছিল করনাকের মন্দিরে তার দুটো কে শুধু ভাঙতে দিলনা রানীর গোপন প্রেমিক হাপুসেনেব। রাজাকে বললো আমুনের পবিত্র মন্দিরে ভাঙচোর করলে ফারাও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে। মূল্য হিসাবে অবশ্য তাকে দিতে হলো মূল পুরোহিতের আসন। সরে দাঁড়াতে হলো তাকে। সেই দুটো ওবেলিস্ক এর একটা কন্যা হাটসেপসুট দান করেছিল তার আদরের বাবা ঠোটমোস ১ এর উদ্দেশ্যে। সেটার থেকে মুছে দেওয়া হল হাটসেপসুটের নাম। আর একটা যেটা নিজের উদ্দেশ্যে ছিল সেটার চারধারে আরও বড় পাথরের খাঁচা বানিয়ে ঘিরে ধরে ঢেকে দেওয়া হল যাতে কেউ আর না দেখতে পারে। আর কোন অজ্ঞাত কারণে দের-এল-বাহরির সেই মন্দিরটা রেখে তার সামনে হাটসেপসুটের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। দেওয়ালে আঁকা তার মুখগুলোকে মুছে দেওয়া হল বা বিকৃত করা হল। কেউ জানেনা কে করল সেই কাজ। ঠোটমোস ৩ না একদিন নিখোঁজ হয়ে যাওয়া শেষেন্মুট। ইতিহাস তারপর চলল নিজের গতিতে। সেই দাড়ি পরা ফারাও যে আসলে এক মহিলা কেউ জানলোনা। সবাই জানলো ঠোটমোস ২ এর পর রাজা হলো ঠোটমোস ৩।

কিন্তু ইতিহাস বড় মজার। এই গুঁড়ো গুঁড়ো মূর্তিই একদিন প্রশ্ন তুলল ইতিহাসবিদের মনে। ফারাওয়ার মূর্তি ভগবানের মূর্তির সমান। সময় ভেঙেছে অনেক কিন্তু গুঁড়ো গুঁড়ো করেনি। সময় ভাঙ্গে নিজের খেয়ালে। কখনো মাথা কখনো হাত কখনো পা। কিন্তু এ যে মানুষেরই কাজ। কে করলো, কেনই বা। ব্যাস খুঁজতে খুঁজতে বর্তমান ইতিহাস পেয়ে গেল ভুলে যাওয়া প্রাচীন ইতিহাসের রাজা বা রানী হাটসেপসুটকে।

হাটসেপসুট চলে যাওয়ার অনেক পরে মানে আরও চারহাজার বছর পর একদিন করনাকের মন্দিরে প্রত্নতত্ত্ববিদ খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়ে গেলো সেই ওবেলিস্ক যা ঢেকে দেওয়া হয়েছিলো আরেকটা পাথরের দেওয়াল দিয়ে। ইতিহাসে আবার ফিরে এলো হাটসেপসুট। নারীবাদী সময়ে নারী হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো দাড়ি পরা রানী হাটসেপসুট। নকল দাড়ি নিয়ে জাঁকিয়ে বসলো পুনরায় রানী হাটসেপসুট ইতিহাসের গলিতে মিশরের আর সব ফারাও দের পাড়ায়।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

মিনি আর মুনিয়া

ঘরে ঢুকেই টেনে টেনে পর্দা গুলো খুলে দিল মিনি।

"কি ব্যাপার কি ? আলো আসছে না তো ঘরে, আমি না থাকলে ঘরে আলোও কি ঠিকঠাক আসবে না ?"

সোফায় বসে টিভির দিকে তাকিয়ে মুনিয়া –

"কি দেখছো?"

"ও ওই তোমার পোলারবেয়ার ছানা আর তাদের মা ?"

"হ্যাঁ পোলার বেয়ার।"

কয়েকমুহূর্ত টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে মিনি।

"আচ্ছা শোনো আমার বড্ড খিদে পেয়েছে কি করা যায় বলোতো ?"

"কি খাব ?"

"হ্যাঁ কি খাই বলতো আমরা ? মুড়ি খাব, মুড়ি বেশ করে পেঁয়াজ দিয়ে মেখে, একটু লঙ্কা, চানাচুর আর একটুখানি সর্ষের তেল দিয়ে। তুমি ততক্ষণ দেখো পোলার মা কি করছে। ও শোনো, আরতি কে আমি কয়েকটা জিনিস আনতে পাঠিয়েছি। এক্ষুণি এসে যাবে সিঁড়িতেই ওর সাথে দেখা হল।"

মিনি দুটো বাটিতে মুড়ি আনলো। একটা হালকা গোলাপী রঙের বাটি খুব সুন্দর একটা চামচ দিয়ে মুনিয়াকে দিল। অল্প এইটুকুন মুড়ি।

"নাও। এই চামচ দিয়ে একটু একটু করে তোলো, তারপর আস্তে আস্তে খাও। তোমাকে আমি লঙ্কা দিইনি। দু-একটা দিয়েছি। বেশি লঙ্কা খেলে তোমার ঝাল লাগবে, বুঝলে মুনিয়া ?

আচ্ছা বলতো কার নাম মুনিয়া ?"

"আমি মুনিয়া।" বলে মুনিয়া নিজের বুকে হাত রাখলো।

"কে মুনিয়া ডাকত তোমাকে ?"

"ছোট পিসিমনি, কাকু ঠাম্মি বাবা সবাই ডাকে। মা ডাকে পাখি। ছোট পিসিমনি মুন্নিও বলে।

"ছোট পিসিমনি তোমাকে অনেক গল্প বলে, না ?"

"হ্যাঁ। এই তো সব অ্যানিমেলসের আর ছানাদের গল্প। বায়োলজি টিচার তো ছোট পিসিমণি। টিঙ্কু, তপু, নুপুর টুলু আর আমাকে। দুপুরে বারান্দায় চিক টেনে। খুব গরম হয়, খুব গরম।"

"তোমরা শ্রীরামপুর যেতে গরমের ছুটিতে ?"

"শ্রীরামপুর দাদুর বাড়ি।"

"ইস, দাদুর বাড়ি শুনে মেয়ের মুখ চিকচিক করছে দ্যাখো। না, অতটা চিকচিক করছে না তো . . . তোমাকে একটু ক্রিম মাখাতে হবে। একটু মালিশ দরকার। বেশ খসখস করছে। দেখি একটু।"

মুনিয়ার কপালে একটু আঙ্গুল বুলিয়ে বললো –

"আরতিটা যে কি করে . . . বলেছিলাম রোজ একটু ক্রিম মাখাবি চানের পর।"

"না ক্রিম না।" মুনিয়া প্রতিবাদ করলো।

"ক্রিম না তো কি ? তুহিনা ? বসন্ত মালতি ? হি হি . . ."

মুনিয়ার মুখেও এক চিলতে হাসির কড়া নাড়া।

"আচ্ছা এবার বলতো ছোট পিসিমণি যে তোমাদের এত গল্প করতো, কি বলতো ? এদের মধ্যে কোন মা সবচেয়ে ভালো, মানে কোন অ্যানিমাল মা ?"

মুনিয়ার বসে যাওয়া হারানো দৃষ্টিতে অনেক পুরনো এক আলোর ঝিকমিক –

এক নিঃশ্বাসে –

"সোনা দিদি বলে ব্ল্যাক স্পাইডার, আর টিঙ্কু বলে . . ."

"কি বলে টিঙ্কু ?"

"লায়ন মা।"

"আর তুমি কি বলতে, তুমি মুনিয়া দেবী তোমার ফেভারিট মা কে ?"

"ওরাং ওটাং।"

"ওরাং ওটাং কেন ?"

"ওরাং ওটাং মেয়ে, বড় হয়ে গিয়েও মায়ের কাছে যায়, ফিরে যায় তার মাকে দেখতে।"

মিনি স্তব্ধ হয়ে গেল। এটা নতুন। এটা এর আগে কখনো বলেনি মুনিয়া।

"ও তাই ? আর কি করে ওরা ?

"ওরাং ওটাং মা, মা সারাদিন রোজ একটা করে বাসা বাঁধে। সেখানে তার বেবিকে শোয়ায়। এত কাজ করে, কষ্ট করে, কিন্তু বেবিকে কখনো নিচে রাখে না। বাসা বাঁধে, বেবিকে কোলে নিয়ে। পরের দিন আবার নতুন বাসা বাঁধে। অনেক অনেক বাসা।"

আজ মিনির চোখে জল এসে গেল।

"বাঃ কি দারুণ।"

"আচ্ছা এবার আমি তোমাকে একটা গল্প বলি?" মিনি বললো।

"আমার মায়ের গল্প। আচ্ছা বলতো মুনিয়া, তুমি আমার মাকে চেনো ?"

মুনিয়ার চোখ এই প্রশ্নটাতে কেমন একটা হাঁক পাঁক করে ওঠে। গলার কাছে একটা শিরা কাঁপতে থাকে থিরথির – মুখটা একটু লাল। মিনি সাবধান হল।

"এই গল্পটা আমার মা আমাকে বলেছিল। রাজগীরের গল্প। মুনিয়া, তুমি গেছো রাজগীর ?

"রাজগীর।"

"মুনিয়া জানো আমার মায়ের নাম কি ? মনে হয় জানো না। আচ্ছা আমি বলছি। খুব মজার। আমার মায়ের নামও না-মুনিয়া। তুমি যেমন ছোট মুনিয়া, তোমার মায়ের, বাবার, ছোটপিসিমণি, কাকুনের – আমার মা মুনিয়া বড় মেয়ে এই এতটা" হাত দিয়ে দেখালো মিনি। তার মেয়ে মানে ছোট্ট আমি, মা, বাবা গেছিলাম।

"ওই দেখো আমার মার কোলে আমি ছোট্ট ।"

মা বাবা আর মিনির ছবি দেয়ালে, একটা সিপিয়া টোনের মধ্যে দিয়ে যেন – তবু তার মধ্যেও মায়ের বেগুনি শাড়ি, কপালে টিপ, গলার মটর দানা হার, তরুণী মুখে চোখে লুকোনো হাসি . . . দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বইছে কুলকুল। বাবার মুখে দিব্যি চওড়া হাসি। কিন্তু কেন জানি না, মিনি ভীষণ সিরিয়াস, মুখটা উৎকট গম্ভীর।

"ওই দেখো মার সামনে আমি।" মুনিয়া ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল . . . যেমন রোজ থাকে ।

"এবার গল্প শোনো, সেই রাজগীরে নালন্দা যাবার পথে, ওদের বাসের টায়ার গেল পাংচার হয়ে। তো ট্যুর পার্টি কি করল, তারা ওখানেই তাবু খাটিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে শুরু করে দিল রান্না। কিন্তু ওদের কাছে কোন দুধ ছিল না। আমার মায়ের মাথা তো খারাপ হয়ে গেল।

মা চারদিকে দেখতে থাকলো আশপাশে কোন বাড়ি ঘর আছে কিনা, বাসের পেছনদিকে যেখানে তাঁবু ছিলো, সেটা পেরিয়ে বেশ দূরে মার মনে হল কুঁড়েঘর মতো দেখা যাচ্ছে।"

"কুঁড়েঘর?"

"হ্যাঁ। তো মা কি করল বলতো ? কাউকে কিছু না বলে হাঁটা দিল। মায়ের মোটে বাইশ বছর বয়স, কলকাতায় মা কাউকে ছাড়া বাইরে প্রায় বের হয়নি, কোথাও একা যায়নি। আমাকে কোলে নিয়ে সে চলেছে তো চলেছে, আমার কিনা দুধ দরকার। আমার বয়স কিন্তু অত কম ছিল না, যে দুধ না হলে আমার চলবে না . . . কিন্তু আমি ছিলাম ওরকমই, সত্যিই দুধ ছাড়া আমার চলত না। একবেলাও।"

এখন মুনিয়া কথাগুলো গিলছে।

"আমি ছিলাম বুঝলে বেশ মোটাসোটা বাচ্চা। আর মা আমার টিংটিঙে রোগা। আমাকে কোলে নিয়ে ঘেমে নেয়ে অনেকক্ষণ বাদে কোনরকম ওই কুঁড়েঘর গুলোর কাছে পৌঁছল। প্রথম বাড়িটার দাওয়ায় বসেছিলেন একটা বুড়ো লোক। পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত।

মা তাকে বলল "বাচ্চা কা দুধ মিলেগা ? দুধ নেহি হ্যায়। উধার বাস খারাপ হুয়া।"

হঠাৎ এরকম শহুরে তরুণী একজন মেয়েকে বাচ্চা কোলে দেখে, তারপর তার মুখে ওরকম অপূর্ব হিন্দি শুনে বুড়ো একটু চুপ করে রইলেন, তারপর হিন্দিতে ঘরের দিকে তাকিয়ে কাউকে কিছু বললেন। একজন বয়স্ক মহিলা

মাথায় ঘোমটা, বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে উঠোনে নেমে অন্যদিকে একটা ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে, চকচকে পেতলের বাটিতে দুধ আর কি সুন্দর নাকি একটা ঝিনুক, খুব সুন্দর সেপের। আনন্দে আমার মা তো আত্মহারা, মেয়ের দুধ জোগাড় করে ফেলেছে ঐরকম অচেনা বিদেশ বিভুঁইতে . . . মা'তো সুকরিয়া, সুকরিয়া বলে অস্থির। ওই কথাটা নাকি হিন্দি গান থেকে শিখেছিল। তারপরে দাওয়ায় বেশ গুছিয়ে বসে, আমাকে কোলে ফেলে, ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে দিল। মার যে সে কি আনন্দ ! ভেবে দেখো মুনিয়া আমার মা, মানে বড় মুনিয়া কিন্তু একবারও আমাকে কোল থেকে নামায়নি। ওই ওরাং ওটাং মায়েদের মতই আমার মাও চ্যাম্পিয়ন ।"

"চ্যাম্পিয়ন"। মুনিয়া বললো।

"তারপর কি হল বলতো ? একসাথে মা 'বাটি ঝিনুক কাঁহা ধোনা' জিজ্ঞেস করছিলো, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করছিল, তারপর বটুয়া থেকে টাকা বার করে দিতে যাচ্ছিল।

দুধের দাম টা দিতে হবে তো . . . তখন কি হল জানো ?"

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করে গেলো মিনি।

মুনিয়া বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে –

"ওই বয়স্ক মহিলা বুড়ো লোককে ফিসফিস করে কি বললেন; বুড়ো মানুষটি হেসে বললেন "তুমহারি বেটি হামারি বেটি নেহি হ্যায় ? পয়সা লেঙ্গে তুমসে ?"

মা তো অবাক।

"ঠেয়রো বেটি, ইয়ে লেতি যাও।"

ওই ফাঁকে চট করে ওই বয়স্ক মহিলা ঝিনুকটা ধুয়ে এনেছেন ওটা আঁচল দিয়ে মুছে মার হাতে দিলেন।

"বিটিয়াকো দুধ পিলানা।"

মা ততক্ষণে প্রায় কাঁদতে শুরু করেছে।

গল্পটা শেষ হতে হতে মিনি ওঠে, ওয়াল ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার খুলে একটা খুব সুন্দর নীল বাক্স নিয়ে আসে। খোলে। এখনো চকচক করছে ঝিনুকটা – মুনিয়ার হাতে দেয়। ওই ঝিনুকটা মুনিয়ার জীবনের সবথেকে প্রিয় গল্প। মুনিয়া দুর্বল শির বার করা হাতে ঝিনুকটা ধরে। হাতটা একটু একটু কাঁপে। ঠোঁটও।

মুহূর্তরা গড়ায়, পল, অনুপল . . .

মিনি নিজের হৃদস্পন্দন যেন শুনতে পায় একটা মিরাকেলের আশায় – যে ঝিনুকটা যদি আজ চাবি হয়ে যায়, খুলে দেয় মুনিয়ার স্মৃতির দরজা। কিন্তু না, মিরাকেল হয় না কাঁপতে থাকা মুনিয়ার হাত থেকে আস্তে আস্তে ঝিনুকটা নিয়ে নেয় মিনি। বাক্সে তুলে রাখে। যেমন রাখে, প্রত্যেকদিন।

কালকের বিকেলও, আজকের বিকেল। জানলার সবুজ পর্দা দিয়ে হয়তো আরেকটু হাওয়া অথবা তেজি আলো। সন্ধ্যে নামবে একটু একটু করে . . . ছোটপিসিমণি, শ্রীরামপুর, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল নিয়ে সোফায় পাশাপাশি বসে থাকবে –

মা আর মেয়ে।

মেয়ের চুল সাদা, শীর্ণ ছোট শরীর, বেভুল হয়ে আসা চোখ –

মায়ের ক্লাচ দিয়ে বাঁধা উল্টানো চুলে দু একটা রুপোলি রেখা, চোখের নিচে দিন শেষের ক্লান্তি ।

মায়ের বলিষ্ঠ ভরাট হাত, সন্ধানী আঙ্গুল মেয়ের পাকা চুলে ভরা মাথায় তেল মাখাতে মাখাতে, গল্প করে ভুলিয়ে একটু ছানা বা উপমা খাওয়াতে খাওয়াতে, স্মৃতি খোঁজে প্রত্যেকদিন। আর তারপরে ওই স্মৃতির খড়কুটো দিয়ে বানায় একটা বাসা, জেনেই, যে কালকে ওটা আর থাকবে না –

আবার নতুন বাসা তৈরি করতে হবে। তবু একটু একটু করে তার হারাতে থাকা বুড়ো মেয়েকে, কিছুতেই হারাতে দেয় না মা।

পাশাপাশি বসে থাকে সোফায়।

মা আর মেয়ে ।

মিনি আর মুনিয়া।

সুজয় দত্ত

সমস্যা

নাঃ, থালায় ভাত ফেলে উঠে যাওয়ার জো নেই। একজনের শ্যেনদৃষ্টি আমার পাতের ওপর। পেটে জায়গা থাক আর না থাক, বাকি ডালমাখা ভাত আর তরকারিগুলো শেষ করে তবে নিষ্কৃতি। নাহলেই বকুনি। ওদিকে খাবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি পাশের ফ্ল্যাট থেকে চিড়ে আর দই ডাকছে হাত নেড়ে। এখুনি ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের একচিলতে মাঠটায় দুপুরের বলখেলা শুরু হবে আমাদের, চলবে যতক্ষণ না বিকেলে বড়রা ইস্কুল থেকে ফিরে মাঠের দখল নেয় ততক্ষণ। চিড়ে আর দই হল আমার দুই প্রাণের বন্ধু, মুখার্জিবাড়ীর সেজো আর ছোট ছেলে। আসল নাম চিরন্তন আর দ্বৈপায়ন, আমরা পাড়ার ছেলেরা ঐ বলে ডাকি। কী মজা ওদের ! চার ভাই দুই বোনের গাদাগাদি দু-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট, এগারোটায় ইস্কুল ছুটি হলেই সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো, কে কখন খেলো না-খেলো কারুর কোনো নজর নেই, শাসন বারণের কোনো বালাই নেই। চেহারাও সেরকম – ডিগডিগে রোগা সবকটা। কিন্তু দম আছে চার ভাইয়েরই, দৌড়ে পারা যায়না ওদের সঙ্গে। পায়ে বল পড়লে কারুর ক্ষমতা নেই আটকানোর – সোজা গোল। আর আমি ? দিনের পর দিন পেট ঠেসে ভাত গিলে গিলে নাদুসনুদুস চেহারা হচ্ছে, বন্ধুরা আড়ালে মোটা বলে, মাঠে গোলকীপার হয়ে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকতেই রীতিমতো হাঁসফাঁস অবস্থা। এই সব কিছুর জন্য দায়ী ওই একজনই। শুরুতে যার কথা বলছিলাম।

সেই একই ব্যক্তি আবার ছুটিছাটার দিনে, এমনকি গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটিতেও কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে দুবেলা পড়তে না বসলে অথবা হোমওয়ার্ক আদ্ধেক ফেলে রেখে রেডিওতে খেলার রিলে শুনতে বসলে এমন চীৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেবে যে আশপাশের প্রতিটা ফ্ল্যাটের প্রত্যেকে জেনে যাবে কী আমার অপরাধ। শুধু কি তাই ? কয়েকবার হাতপাখার ডাঁটি আর রুটি বেলার বেলনের বাড়িও পড়েছে আমার পিঠে, স্রেফ রান্নাঘর থেকে আমার জোরে জোরে মুখস্থ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না বলে। আশ্চর্য তো! ইস্কুলে পড়াটা দিয়েছে কাকে – তোমাকে না আমাকে ? এমন চেঁচিয়ে পড়তে হবে আমায় যাতে তোমারও মুখস্থ হয়ে যায় ? আবার নিজে দুধ উথলে পড়ার বা তরকারি পুড়ে যাওয়ার ভয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরোতে পারেনা বলে বাবাকে পাহারাদার রেখে দেয় যাতে আমি সুযোগ পেয়ে ফাঁকি না দিতে পারি। বাবা এমনিতে ঠান্ডা মেজাজের মানুষ, বিশেষ বকেঝকে না। কিন্তু রান্নাঘর থেকে যদি ক্রমাগত কেউ বলে যায়, "তোমার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ছেলেটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে", তাহলে কার না পৌরুষে ঘা লাগে ? ব্যস, ছেলেকে একটু রগড়ানি দিয়ে অভিভাবকসুলভ দায়িত্ববোধের প্রমাণ রান্নাঘরে পেশ করে তবে শান্তি। আর এর ফলে পাড়ার বন্ধুবান্ধবের কাছে আমার প্রেস্টিজ যে কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকছে, সেকথা আর কে ভাবে ? এইতো সেদিন, বাথরুমের দরজার পাল্লায় হাতটা একটু চিপ্টে গিয়ে কালশিরে পড়েছে, বিকেলে মাঠে দেখা হতেই লাল্টু দাঁত বার করে হেসে বলল, "কিরে, মাসীর কাছে খেয়েছিস তো আবার ? কি করেছিলি ?"। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে প্রতি বছর ডিসেম্বরে অ্যানুয়ালের রেজাল্ট বেরোবার দিনে যখন ফার্স্ট-সেকেন্ড প্রাইজ নিয়ে ফিরি, তখন দরজায় একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে ঠায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকা মানুষটাকে বলি, "দেবোনা এগুলো তোমাকে, যাও ! মোটেই তোমার বকুনি আর পিটুনির জন্য হয়নি এসব"। কিন্তু আবার ওগুলো হাতে নিয়ে এমন ছলছল চোখে পরম যত্নে বুকে আঁকড়ে ধরে, মায়াও হয়।

ইস্কুলের গন্ডী পেরিয়ে বারো ক্লাস পাশ করে কলেজে যাব – সেখানেও নিস্তার আছে ? পুরো আঠেরোটা বছর আমাকে বাড়ীর নাড়ুগোপাল করে চোখে চোখে রেখে দেওয়ার পর এখন বায়না – কলেজ হস্টেলে থাকতে দেবে না। সেখানে গেলে নাকি আমার শরীরের বারোটা বাজবে আর পড়াশোনার চোদ্দটা। মহা মুশকিল তো! তোমার কোলের

খোকন হয়ে থাকার জন্য আমি এরকম একটা নামকরা কলেজে স্কলারশিপ পেয়েও ছেড়ে দেব ? যাইহোক, শেষে অনেক জেদাজেদি করে তাকে চোখের জলে নাকের জলে ভাসিয়ে ভর্তি হলাম সেই আবাসিক কলেজেই। বাড়ী থেকে ট্রেন বদলে বদলে যেতে লাগে ঘন্টা দেড়েক, বাসে গেলে আরোই বেশী। কাজেই হস্টেলে না থেকে উপায় কি ? ওমা, একদিন বিকেলে কলেজ করে হস্টেলে ফিরে দেখি আমার ঘরের দরজাটা ভেজানো, তালা ঝুলছে কিন্তু খোলা অবস্থায়। দেখেই বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল – আমি কি আজ তালা দিয়ে যেতে ভুলে গেছি ? ভেতরে বইখাতা আর সাধারণ জামাকাপড় ছাড়া বিশেষ কিছু না থাকলেও একটা নতুন ক্যালকুলেটর আছে, আর আছে আমার এ-মাসের স্কলারশিপের টাকা। কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা ঠেলে দেখি ও হরি – আমার বিছানায় বসে পাখার তলায় হাওয়া খাচ্ছেন সেই তিনি। কী ব্যাপার ? না, বাড়ীতে কাল অনেকদিন বাদে লোকজন এসেছিল বলে চিংড়ির মালাইকারি আর নলেনগুড়ের পায়েস রাঁধা হয়েছে, আমার তো খুব প্রিয় জিনিস, তাই কৌটো করে আমাকে একটু দিয়ে যেতে মন চাইল। হস্টেলে তো দুবেলা ছাইপাঁশ খাওয়ায়, আজ যেন ওসব না খেয়ে এগুলোই খাই। বিস্ময় কাটিয়ে জানতে চাইলাম, ঘরে ঢুকলে কিভাবে ? উত্তর পেলাম আমার রুমমেট দুপুরে লাঞ্চব্রেকে হস্টেলে খেতে এসেছিল, সে-ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুলে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন, "তুই দুপুরে খেতে এলিনা যে ?" আমি আর কী করব, যাহোক একটা মিথ্যে অজুহাত দিলাম। আসলে লাঞ্চের পরের পিরিয়ডেই একটা শক্ত পরীক্ষা ছিল, আমি ওই একঘন্টার ব্রেকে শেষমুহূর্তের পড়াটা একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম। ব্যস, সেই যে একদিন দুপুরে না খাওয়ার "অপরাধ" ধরা পড়ে গেল, তার পরের চার বছর আমার হাজার বারণ সত্ত্বেও বাড়ী থেকে মাঝেমাঝেই চলে এসেছে শিম-বেগুন-পোস্ত থেকে শুরু করে পমফ্রেট মাছের ঝাল, আমের আচার থেকে শুরু করে পিঠেপুলি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করেই খেতাম সেগুলো, কিন্তু মনে মনে কী লজ্জা যে লাগত। হস্টেলে আমার নামই হয়ে গেছিল 'রাজভোগ দত্ত'।

গ্র্যাজুয়েশন করার পর পোস্টগ্র্যাজুয়েট পড়ার সময় সেই সুযোগ আর রাখিনি অবশ্য। চলে গেলাম দিল্লীর এক নামী ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে আবার অন্য গল্প। দেখতে শুনতে আমি ফিল্মি হীরোর মতো না হলেও চার বছর হোস্টেলজীবন যাপনের পর খুব একটা খারাপও না। আর পড়াশোনায় ফাঁকি না দিয়েও মোটামুটি মিশুকে। তাই অচিরেই বসন্তের বাতাসে ফুল ফুটতে শুরু করল মধুকুঞ্জে। আর আমি এইসব 'খেলার' কথা গোপন রাখতে চাইলেও লোকে দেবে না রাখতে কিছুতেই। চারপাশে সব 'উপকারী' বন্ধুরা ঘুরঘুর করছে, তাদের অ্যান্টেনা চব্বিশ ঘন্টা খাড়া। রসালো খবর সংগ্রহ আর সম্প্রচার – দুটোতেই সমান আসক্তি। তাদেরই কারুর মাধ্যমে কথাটা চালান হয়ে গেল আমার কলকাতার বাড়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে ফোনাঘাত। ওপ্রান্তে রীতিমতো হাউমাউ করে আর্জি – আমি যেন এক্ষুণি দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসে যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সীতে ভর্তির অ্যাপ্লিকেশন করি। একটা বাইশ-তেইশ বছরের ছেলের চেয়ে একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে কত বেশী সেয়ানা আর পরিণতমস্তিষ্ক হয় সেই জ্ঞানগম্যি তো আমার নেই। তাই বুঝতেও পারছিনা কী মারাত্মক রাস্তায় পা বাড়িয়েছি ! আমার সরলতা আর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অচিরেই আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে ওই –। বলে যে বিশেষণটা দিয়ে তিনি শেষ করলেন সেটা বিশেষ প্রীতিকর নয় বলে এখানে আর লিখছি না। আমি তো হতভম্ব, বাকরুদ্ধ, ফোনের রিসিভার কানে নিয়ে চুপ করে আছি। ওপ্রান্ত থেকে "কী হল কী, কিছু বলছিস না কেন ?" বলে প্রবল ধমক ভেসে আসতেই আমতা আমতা করে বললাম যা শোনা যাচ্ছে ওসব গুজব ছাড়া আর কিচ্ছু না। আমি দিল্লী এসেছি মন দিয়ে এম এস সি-টা শেষ করে এম ফিলে ভর্তি হতে। ওটাই আমার পাখীর চোখ, আর কোনো দিকে চোখ বা আড়চোখ – কোনোটাই নেই। এই মিনমিনে গলার স্তোকবাক্য শুনে কি আর তিনি আশ্বস্ত বা নিরস্ত হন ? সেই সেমিস্টার চলাকালীনই সোজা দিল্লী এসে হাজির বাবাকে জোর করে অফিস ছুটি নিইয়ে। সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে হবে না ? বন্ধুমহলে যারা আমার দুরবস্থার খবর রাখে তাদের রাতের আড্ডা আর সপ্তাহান্তের গুলতানির আমি হয়ে উঠলাম মুখরোচক স্ন্যাক। স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের একটা ছেলের 'গার্জেন' কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে তাকে তার প্রেমিকার হাত থেকে আড়াল করার জন্য – ইউনিভার্সিটির অবাঙালী ছাত্রছাত্রীদের কাছে এর চেয়ে মনোরঞ্জক বিনোদন আর কী হতে পারে ?

সেই শেষ নয়, এরপর কয়েক বছর ধরে প্রতি সেমিস্টারে চললো আমার ওপর নজরদারি, হাজার মাইল ট্রেন ঠেঙিয়ে দিল্লী এসে এসে। কিন্তু ততদিনে আমার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্কটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে অভিভাবকের সতর্কবাণী বা চোখরাঙানিতে আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাঙ্গালোরে বেড়ে ওঠা সেই স্মার্ট, অনাড়ম্বর মেয়েটি আমার জীবনে জড়িয়ে গেছে গভীরভাবে, আমরা যুগল পথচলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। কলকাতায় আমার বাড়ীর লোকজন তো আর ঘাসে মুখ ডুবিয়ে থাকে না, তারা আঁচ পাচ্ছিল সবই, কিন্তু যখন দেখল আমি খুব ভালভাবে স্নাতকোত্তর পাশ করে এম ফিলে বেশ নামকরা এক গবেষকের কাছে কাজ শুরু করেছি, অন্ততঃ প্রেমের হাঁড়িকাঠে ক্যারিয়ার বলি যাওয়ার ভয়টা কাটল। এম ফিলের দ্বিতীয় বছরে গরমের ছুটিতে আমরা পুরো ব্যাপারটাকে প্রকাশ্যে এনে ফেললাম। ও আমাকে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে গেল ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, আর আমি ওকে কলকাতায়। ভাগ্য ভাল আমার, ব্যাঙ্গালোরের উচ্চবিত্ত পরিবারের সচ্ছলতা আর আধুনিকতায় মানুষ হয়েও প্রিয়াঙ্কা কলকাতার আধা-রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জাদু জানত। সে জাদু এমন জাদু যে তিন বছরের সব সন্দেহ আর আশংকা ধুয়ে যেতে তিন সপ্তাহও লাগল না। ছুটি শেষে যখন আবার আমাদের দিল্লী ফিরে যাওয়ার সময় এল, তখন কে কার বাবা-মা আর কে কার আঙ্কেল-আন্টি – বোঝা মুশকিল।

এবং এর পরেই ঘুরে গেল খেলাটা। কলকাতার সেই তিনি এখন আমার ওপর পাহারাদারির এক নতুন রাস্তা পেয়ে গেছেন। ফোনগুলো এখন আর আমার কাছে নয়, বেশীরভাগই প্রিয়াঙ্কার কাছে আসে। আমি যে কয়েকটা পাই, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানা উপদেশ। যেমন, প্রেমকে বেশীদিন অরক্ষিত রাখতে নেই, তাড়াতাড়ি বিবাহবন্ধনে বেঁধে ফেলতে হয়। একটা পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করলে তাদের বাচ্চাকাচ্চার শৈশব বিঘ্নিত হয়। এম ফিল শেষ হলে আমি যেন আবার নতুন কোনো পড়াশোনার লাইন বেছে না নিয়ে চাকরির চেষ্টা করি, কারণ সংসারের পুরুষমানুষকেই আগে স্বাবলম্বী হতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি চুপ করে শুনতাম, তর্ক বা প্রতিবাদ করার চেষ্টা বৃথা। আমি আর প্রিয়াঙ্কা তো মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি কী করব না করব। এম ফিলের ফাইনাল ইয়ারে তখন দুজনেরই চাকরি খোঁজা চলছে পুরোদমে। যতক্ষণ না দুজনেই কর্মজীবনে সেটল্ড হচ্ছি, বিয়ের প্রশ্নই নেই। ব্যাঙ্গালোরের পূর্ণ সমর্থন আছে এই পরিকল্পনায়, কিন্তু কলকাতা ধৈর্য্য ধরতে নারাজ।

জীবন আর কবে সরলরেখায় চলে ? আশা আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক থেকে যায় হামেশাই। আমরাও ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম তেমন হল না। আমি গোটা দুই লোভনীয় অফার পেলাম মুম্বই আর চেন্নাই থেকে, প্রিয়ঙ্কার দেরী হল একটু। শেষে হায়দ্রাবাদের একটা কনসাল্টিং ফার্মে পছন্দসই পজিশন পেতেই ও চটপট "হ্যাঁ" বলে দিল। আমি ততদিনে দিল্লীকে বিদায় জানিয়ে দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাসিন্দা হয়ে গেছি। ঘনসোলি-তে একটা খুপরি ফ্ল্যাটে একার সংসার পেতে বসেছি। মনটা হু হু করছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর যে ছিল সব সময়ের সঙ্গী, আজ সে শুধুই ফোনের ওপারে। বলাই বাহুল্য, এতে আমার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট পাচ্ছিল কলকাতায় আরেকজন। প্রথমতঃ তাকে অনেক বলেও বোঝাতে পারিনি যে আমরা দুজনেই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম কলকাতায় চাকরি পেতে। যুৎসই কিছু না পাওয়াতেই অন্য শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত – তাকে ইচ্ছে করে দূরে ঠেলে রাখার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যারা দুদিন বাদে বিয়ে করতে চলেছে তারা কি আর শখ করে পরস্পরের থেকে সাড়ে চারশো মাইল দূরে থাকে ? নেহাত বাধ্য হয়েছি তাই। এবং এটাই চূড়ান্ত নয়, সুযোগ পেলেই দুজনে একসঙ্গে একজায়গায় সেটল করব। অতএব এত উতলা হবার কিছু নেই। তাছাড়া প্রিয়াঙ্কা খুবই করিৎকর্মা আর স্বনির্ভর, আমাকে ছাড়া সে হিমশিম খাচ্ছে এমন তো নয়। আর ঘনসলি যা জমজমাট জায়গা, আমাকেও রোজ কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে আলুসেদ্ধ-ভাত খেতে হচ্ছে না মোটেই – ফ্ল্যাটের নীচে নামলেই একগাদা দোকানপাট। কিন্তু যতই বলি, কে শোনে কার কথা! ফোনের ওপ্রান্তে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ঘনীভূত হতে থাকে ক্রমশঃ। এভাবে বছর দুয়েক কাটার পর হঠাৎই ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তনের ফলে জীবনের চেনা ছকটা কেমন যেন বদলে গেল। শুরু হয়েছিল ভাল খবর দিয়েই। হায়দ্রাবাদের চাকরিটা করতে করতে গোপনে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছিল প্রিয়াঙ্কা মুম্বাই-এর আশপাশে। আচমকা একদিন অফার পেয়ে গেল মালাড-এর এক জাঁদরেল কোম্পানী থেকে। দারুণ সুখবর, কারণ

আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে তিরিশ কিলোমিটারও নয় ওই জায়গাটা, যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। এই কথাটা জানিয়ে কলকাতায় সবাইকে চমকে দেব বলে ফোন করেছি, উল্টে নিজেই একটা ধাক্কা খেলাম। শুনলাম সদ্য ষাটে পা দেওয়া বাবার একটু আগেই এক বিরাট হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, এখুনি অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, প্রতিবেশীরা আমাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করে পায়নি, নাহলে আধঘন্টা আগেই খবর পেতাম। ব্যস, মাথায় উঠল মালাড, সেই রাতেই ট্রেনের টিকিট কেটে রওনা হলাম আমি, পরদিন সকালে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রিয়াঙ্কা।

ভাগ্যিস পেরেছিলাম যেতে। কারণ সেই দেখাই শেষ দেখা, আর বাড়ী ফেরেনি বাবা। দিন তিনেক যমে মানুষে টানাটানি চলেছিল হাসপাতালের আই সি ইউতে। আঘাতটা সামলাতে বেশ কিছুটা সময় লাগলেও জীবনের বাস্তবতার প্রয়োজনে মন শক্ত করলাম আমি। কিন্তু আমার সেই তিনি ? দীর্ঘ তিন দশকের জীবনসঙ্গীকে এভাবে হারিয়ে বাঁচার সব ইচ্ছেই যেন খুইয়ে বসে আছেন। ভুল বললাম, বসে নয়, শুয়ে। শ্রাদ্ধশান্তি আর নিয়মভঙ্গের সময় তিনি রীতিমতো শয্যাশায়ী, বাড়ীতে দুবেলা ডাক্তার আসছে। এতদিন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম সকলে, এবার সবকিছু মিটে-টিটে যাওয়ার পর ঠান্ডা মাথায় ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে বসলাম আমরা তিনজন – প্রিয়াঙ্কা, আমি আর তিনি। প্রিয়া আর আমি একমত – এই অবস্থায় তাঁকে এখানে ছেড়ে মুম্বাই ফিরে যাওয়া অসম্ভব, নিয়ে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। পৈতৃক ভিটে আপাততঃ থাক তালাবন্ধ, পরে ভাবা যাবে কেয়ারটেকার ইত্যাদির কথা। তবে আমরা বললে তো হবে না, বাড়ীর মালকিনকেও রাজী হতে হবে। সে গুড়ে এক বালতি বালি ছিটিয়ে তিনি বললেন, না, বিয়ে হয়ে এসে অবধি যেখানে থেকেছেন, যেটা ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ের কথা কোনোদিন কল্পনাতেও আনেননি, পরতে পরতে স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত সেই বাড়ী থেকে তাঁকে উৎখাত করে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি কিরকম জেদী মানুষ, তাই পীড়াপীড়িতে লাভ হবেনা জানতাম। তড়িঘড়ি একজন চব্বিশ ঘন্টার কেয়ারটেকার ঠিক করে একরাশ দুশ্চিন্তা মনে নিয়ে ফিরে গেলাম আমরা যে যার কাজের জায়গায়।

এর পরের বছরখানেক আমি আর প্রিয়া মুম্বাই থেকে একটু ঘনঘনই কলকাতা গেলাম। তিনি পথ চেয়ে বসে থাকতেন আমাদের। কাছে পেলে আর ছাড়তে চাইতেন না – বিশেষতঃ বৌমাকে। প্রিয়ার সঙ্গে সবসময়ই দারুণ জমে ওঁর, এখন একা হয়ে যাওয়ার পর তো আরোই বেশী। বার বার আক্ষেপ – কেন বিয়ের অনুষ্ঠানটা আমরা বাবা থাকতে সেরে নিলাম না, এখন কালাশৌচের জন্য কতদিন পিছিয়ে গেল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ তো সেই কত আগেই হয়ে গেছে। আমরা বলতাম হবে হবে, আর তো কটা মাস, তারপরেই ঘোষণা করব অনুষ্ঠানটা। কিন্তু হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলাম আর এভাবে চালানো যাবে না বেশীদিন – প্রিয়াঙ্কা পেরে উঠবে না। কারণ ওর শরীর সংকেত দিয়েছে আমাদের সংসারে এক তৃতীয় ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করার প্রস্তুতি শুরু করতে। ইতিমধ্যে আমরা সেই ঘনসলির খুপরি ফ্ল্যাট ছেড়ে একটা আরো বড়সড়, সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে উঠে গেছি। সেখানে ব্যাঙ্গালোর থেকে আমার শ্বশুর-শাশুড়িও এসে ঘুরে গেছেন। আর প্রিয়ার শাশুড়ি ? ঠাকুমা হতে যাওয়ার খবর শুনে আহ্লাদে আটখানা, আমাদের নতুন ফ্ল্যাটের ছবি দেখে দারুন খুশী, কিন্তু তাঁকে কলকাতার বাড়ী থেকে নড়ায় কার সাধ্যি ? "আমার ঠাকুরঘরে রোজ ফল-বাতাসা দেবে কে ? ধুপ আর প্রদীপ জ্বালবে কে ? গোপালকে চান করিয়ে ভোগ দেবে কে ? তুলসীগাছে জল দেবে কে ?" ইত্যাদি লম্বা লিস্ট। এর একটার জন্যও কেয়ারটেকারের ওপর নির্ভর করা যায় না। শেষে প্রিয়ার অনেক পীড়াপীড়ি, অনেক ছলছল চোখে আবদার-টাব্দারের পর নিমরাজি হল ওর ডিউ ডেটের কাছাকাছি সময়ে এ-বাড়ীকে অল্প কিছুদিনের জন্য মেজোমাসী আর মাসতুতো দিদির জিম্মায় রেখে মুম্বাই যাবার। এই সমস্যাটা যাহোক একরকম মিটল, কিন্তু নতুন এক সমস্যার চারাগাছ গজিয়ে উঠছিল আমাদের সকলের অলক্ষ্যে। তা হল তাঁর স্বাস্থ্য। ষাট ছুঁইছুঁই শরীরটা যে আর আগের মতো কর্মঠ নেই সেটা অনেকদিন থেকেই দেখছি, কিন্তু বাবা চলে যাবার পর একটু দ্রুতই যেন ভাঙছিল শরীর। খিদে কমে গেছে অনেক, রাতে ভাল ঘুম হয়না, সারাদিন কেমন যেন ক্লান্ত-ক্লান্ত লাগে – এগুলোকে স্বাভাবিক বয়সজনিত লক্ষণ ধরে নিয়ে এতদিন পাড়ার চেনাশোনা ডাক্তারের সাধারণ ওষুধপত্রই চলছিল। এবার কলকাতা এসে যখন দেখলাম দুই পায়ের নীচের অংশ, গোড়ালি আর পাতা বেশ ফুলে রয়েছে, জোর করে নিয়ে গেলাম একজন স্পেশালিস্টের কাছে। জোর

করে, কারণ সেখানেও তীব্র অনীহা, একগুঁয়ে জেদ – "কী হয়েছে কী আমার ? এই বয়সে কত মানুষ বাতের ব্যথায় চলতে পারে না, গাঁটের ব্যথায় দাঁড়াতে পারে না, হাঁপানির রোগে কাত হয়ে পড়ে থাকে, ওসব কোনোকিছু দেখছিস আমার মধ্যে ?"

সত্যিকে তো আর জেদ দিয়ে ঢেকে রাখা যায়না। স্পেশালিস্টের নির্দেশমতো হওয়া পরীক্ষানিরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল সমস্যার উৎস। কিডনী। দুটোর অবস্থাই তেমন ভাল নয়। বড়োজোর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ শতাংশ কর্মক্ষমতা তাদের। কীভাবে, কবে থেকে শুরু হল এই নিঃশব্দ অবক্ষয়, বলা মুশকিল। তবে আমার মামাবাড়ির দিকের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যেহেতু কিডনীজনিত সমস্যার ইতিহাস আছে, বংশগতিও একটা কারণ হতে পারে। মুশকিল হচ্ছে, এরকম একজন রোগীকে বিপদ এড়াতে যে কড়া সতর্কতার মধ্যে থাকতে হয়, সেটা এই ভদ্রমহিলাকে বোঝানো ভীষণ শক্ত। চিরকাল বাড়ীর অন্য দুই সদস্যের সুস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে উপেক্ষা করে আসার যে অভ্যাস শিকড় গেড়ে আছে মনের মধ্যে, তা একটানে উপড়ে ফেলা আমার কম্মো নয়। আর মামাবাড়ীতে তিনিই সবার বড় দিদি, আমার দাদু-দিদার আদরের প্রথম সন্তান, তাই ভাইবোনদের কথায় পাত্তা দেবার প্রয়োজন মনে করেন না কোনোদিনই। একমাত্র ভরসা প্রিয়া। ও যদি ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় গলা জড়িয়ে ধরে, কোলে মাথা রেখে, আদুরে গলায় আবদার-টাবদার করে কোনো ম্যাজিক করতে পারে। ও চেষ্টা করল যথাসাধ্য। কিন্তু আমরা থাকি প্রায় উনিশশো কিলোমিটার দূরে মুম্বাইতে। আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি ওষুধপত্র ঠিকমতো খাচ্ছেন কিনা, শরীরের যত্নআত্তি করছেন কিনা – সেসব কে দেখতে আসছে? অতএব ভাগ্যের হাতেই ছাড়া রইল সবকিছু। সময় গড়িয়ে চলল তার নিজের গতিতে। প্রিয়ার গর্ভে আমাদের সন্তান ক্রমশঃ আরো ঘন ঘন তার অস্তিত্ব জাহির করে জানান দিতে থাকল তার মুক্তির দিন আসন্ন। আর এমনই আমার ভাগ্য, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খারাপ হতে লাগল কলকাতায় একজনের শরীর। প্রিয়ার ডিউ ডেটের কিছুদিন আগে যে তাঁর আমাদের কাছে এসে থাকার কথা, সেই তোড়জোড় করতে যাওয়ার আগেই খবর পেলাম অবস্থার অবনতি হয়েছে, সর্বশেষ রক্তপরীক্ষায় ইউরিয়া-ক্রিয়াটিনিন সাংঘাতিক বেড়েছে, ডাক্তার ডায়ালিসিসের কথা ভেবে দেখছেন। মরীয়া হয়ে ডাক্তারকে কোনোরকমে ফোনে ধরে জানতে চাইলাম আমার ঠিক কী করা উচিত এই মুহূর্তে, কিন্তু দেখলাম উনি নিজেই একটু দ্বিধাগ্রস্ত। শেষে বললেন সাবধানতাবশতঃ কোনো হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করাই ভাল। প্রিয়াকে আমার শাশুড়ির জিম্মায় রেখে ছুটলাম কলকাতা, দেখলাম গা-হাত-পা বেশ ভালরকম ফোলা, একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে ভর্তি করে সঙ্গে রইলাম কয়েকদিন, যতক্ষণ না অবস্থার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে। সে-যাত্রা আর ডায়ালিসিসের দিকে গড়ায়নি ব্যাপারটা, ওষুধপত্র আর পরিষেবা দিয়েই সামলে দেওয়া গেছিল। কিন্তু শরীর ভীষণ দুর্বল তাঁর, খাওয়াদাওয়ায় প্রবল অরুচি। ওদিকে আমাকে তো দেশের উল্টোদিকে একজনের পৃথিবীতে আবির্ভাবের আয়োজনেও দরকার, সেখানেও যেকোনো দিন ঘটতে পারে ব্যাপারটা। অতএব তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে এনে সকালের আর রাতের শিফটে দুজন আয়া রেখে আমার এক নিকট আত্মীয়কে বললাম কটা দিন আমাদের বাড়ীতে থাকতে। আমাকে বিদায় দেবার সময় হাতটা আর ছাড়তে চাইছিলেন না তিনি।

সেবার কলকাতা গিয়ে যেকটা রাত একা ছিলাম আমাদের বাড়ীতে, একটা বিশেষ কাজ সেরে ফেলার সুযোগ ছাড়িনি। আমার ঠাকুর্দার আমলের কাঠের আলমারি আর বাবার চাকরির প্রথম টাকায় কেনা স্টিলের আলমারির বিভিন্ন তাকের আনাচে কানাচে পুরোনো দিনের অনেক সাদাকালো ছবিভর্তি অ্যালবাম থাকত জানতাম। সেগুলো বার করে বহু বছরের ধুলো ঝেড়ে কয়েকটা আমার ব্যাগে ভরলাম আর বাকিগুলো থেকে কিছু পারিবারিক ছবি সযত্নে খুলে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। আমাদের মুম্বাইয়ের নতুন ফ্ল্যাট প্রিয়ার ছোটবেলার আর জামশেদপুরে ওদের পৈতৃক বাড়ীর অজস্র ছবিতে ভর্তি, কিন্তু আমার জীবনের প্রায় কোনো ছবিই নেই সেখানে। যাইহোক, তারপর অ্যালবামগুলো আবার আলমারিতে রাখতে গিয়ে যে আবিষ্কারটা করলাম, তার জন্য মোটেই তৈরী ছিলাম না। স্টিলের আলমারির চাবি দেওয়া ড্রয়ারে খয়েরি মলাটের কয়েকটা ধুলোপড়া ডায়রী। ভেতরে এ কার হাতের লেখা ? তিনি যে কোনোদিন ডায়রী লিখতেন, একথা কস্মিনকালেও শুনিনি। পাতার ওপরে তারিখ দেখে বুঝলাম বাবা মারা যাওয়ার পর একাকিত্বের দিনগুলো

কাটাবার এটা ছিল একটা উপায়। অদম্য কৌতূহলে পাতা ওল্টাতে শুরু করতেই দেখি প্রথম পাতার প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা, "জানিনা এ পণ্ডশ্রমের কী মানে, তবু আজ খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। আমার জীবনী তো কেউ কখনো লিখবে না, তাই এই ডায়রীর পাতাতেই নীরবে নিঃভৃতে জমা থাক আমার গল্প।"

তার পরের গল্প খুব সংক্ষেপে বলি। কারণ বিশদে বলার সময় বা মন – কোনোটাই নেই এই মুহূর্তে। মাত্র গতকাল, মে মাসের এক মেঘলা গুমোট সকালে আমাদের ঘর আলো করে পৃথিবীতে এসেছে যে, সে এখনো মুম্বইয়ের হাসপাতালের ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডেই আছে তার মায়ের সঙ্গে। নাম আয়ুষ্মান প্রিয়াংশু। আধখানা তার ঠাকুমার দেওয়া, বাকি আধখানা দিদিমার। তাহলে আমি এখন এই বারোশো মাইল দূরে কলকাতার হাসপাতালে বসে কী করছি ? আসলে অনেক বছর আগে এইরকমই এক মে মাসে আমিও পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম প্রথমবারের জন্য। সেদিন আমাকে যাঁর পাশে যত্ন করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে যে আজ তাঁর বিদায়ক্ষণ সমাগত, কিন্তু সমস্ত শরীর-মন সেই চিন্তাটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে চীৎকার করে উঠতে চাইছে – না, না, না। অবশ্য আমার মন কী বলল না বলল, তাতে তো কিছু আসে যায় না – আসল কথা বলবে হাসপাতালের আই সি ইউয়ের ওই মনিটর আর যন্ত্রপাতিগুলো। কাল মুম্বইয়ের নামকরা হাসপাতালের ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে যখন আমার সঙ্গে ন-বছর আগে দিল্লীর ইউনিভার্সিটিতে আলাপ হওয়া এক ব্যাঙ্গালোরবাসী যুবতীর ক্লান্ত শরীরের পাশে শোয়ানো রক্তমাংসের ছোট্ট পুতুলটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েছিলাম, তখনই একটা ফোন এসেছিল কলকাতা থেকে। সেখানকার হাসপাতালে একজন লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। ডায়ালিসিস চলছে কিন্তু তার শরীর সে-ধকল নিতে পারছে না। অবস্থার অবনতি হচ্ছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সবকিছু ফেলে ছুটে এলাম যখন কলকাতায়, ততক্ষণে লড়াই পৌঁছে গেছে আই সি ইউতে।

সেই আই সি ইউয়ের বাইরে এখন বসে আছি আমি ভোর-রাতে। খবরের প্রতীক্ষায়। কী থাকবে সেই খবরে ? নিয়তিই জানে। আমি বরং বসে বসে একটা কাজ সেরে ফেলি। একজনের জীবনীর জন্য একটা যুৎসই নাম ঠিক করা দরকার। লেখা-ফেখা আমার তেমন আসেনা, কিন্তু তা বলে একজনের আত্মকথা গোপনে নিঃশব্দে ডায়রীর জীর্ণ পাতায় বন্দী হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকবে – এ তো আমি বেঁচে থাকতে হতে দেওয়া যায়না। তবে যে ভদ্রমহিলা সারাজীবন আমাকে একটুও স্বস্তিতে থাকতে দেননি, তিনি আজই বা সহজে ছেড়ে দেবেন কেন ? কিছুতেই একটা উপযুক্ত নাম মাথায় আসছে না। একবার ভাবলাম "স্নেহময়ী" লিখি। পরক্ষণেই মনে হল জীবনের প্রথম দিন থেকে আজ অবধি তাঁর কাছে যা পেয়েছি, "স্নেহ" নামক দু-অক্ষরের শব্দটা তো তার ধারেকাছেও পৌঁছয় না। তারপর মাথায় এল "জীবনদাত্রী", কিন্তু নাঃ, শুধু আমার শরীরে জীবন দিয়েই তো তিনি ছেড়ে দেননি এ-পৃথিবীতে। যতদিন পেরেছেন দু-বাহু দিয়ে অপরিসীম যত্নে আগলেছেন সেই জীবনটাকে। আচ্ছা, "জীবনের ধ্রুবতারা" লিখলে কেমন হয় ? মন্দ নয় নামটা।

ঠিক তখনই খবরটা এল আই সি ইউয়ের হিমশীতল গহ্বর থেকে নিষ্ঠুর কাচের দরজা ভেদ করে। জানলার বাইরে ভোরের আকাশও অবশ্য একই কথা বলছিল। চাঁদ ডুবেছে। একটা নতুন তারা জ্বলজ্বল করছে সেখানে।

খনা দেব

একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক সাক্ষাৎকার

কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ আমার মনে ইচ্ছে জাগল দ্বাপর যুগের এক রাজমহিষীর সাক্ষাৎকার নেবার। এ'ব্যাপারে আমার প্রথমে যার নাম মনে এলো, তিনি হচ্ছেন মাতা গান্ধারী। আমার মনে হয় মহাভারতে ওনার অনেক কথাই অব্যক্ত থেকে গেছে। ভাবলাম অন্ততপক্ষে কাল্পনিক ভাবে হলেও একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই ধর্মশীলা নারীর অন্তরের কথাটা জেনে নিতে পারলে মন্দ হয়না। আশা করছি আমার এই প্রয়াস ব্যর্থ হবেনা।

আমি: মাতা গান্ধারী, আপনি যে আমার সঙ্গে এই আলোচনায় বসতে রাজী হয়েছেন, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

গান্ধারী: আরে না, কি যে বলো, হাজার হাজার বছর পর তোমার মত একজন আধুনিক মহিলা যে আমার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে, সে তো আমার সৌভাগ্য।

আমি: আসলে অনেকের মধ্য থেকে আপনাকে বেছে নেবার কারণ হলো, আপনাকে কেবলমাত্র ধর্মশীলা নারী বলে উপস্থাপনা করবার জন্যই কি ব্যাসদেব, বলতে গেলে সভাপর্ব অবদি আপনাকে প্রায় মূক করে রেখেছেন ?

গান্ধারী: কথাটা মন্দ বলনি। আমার শ্বশুরমশাই এই মহাকাব্য লেখবার আগে যে প্রাসঙ্গিক বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, প্রসিদ্ধ কুরুবংশের বিস্তার বর্ণনা করবার সময় তিনি আমার ধর্মশীলতার কথাও বলবেন। এই ধর্মশীলতা বলতে উনি কিন্তু তোমাদের আজকালকার যুগের কৃত্রিম ধর্মচেতনার কথা বলেননি। দ্বাপর যুগে ধর্মচেতনার অর্থ ছিল সমাজবোধ ও ন্যায়ের ভাবনা। শ্বশুরমশাই আমার চরিত্রের মধ্যে এই নীতিবোধটাই দেখাতে চেয়েছিলেন।

আমি: সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার চরিত্রে কেবলমাত্র এই নীতিবোধটা দেখাতে গিয়ে ব্যাসদেব অনেক জায়গায় ওনার পাঠকদেরকেও আপনার মতোই অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন। এতে করে আমার মতো পাঠকের অনেক প্রশ্নই নিরুত্তর থেকে যায়।

গান্ধারী: ঠিক কি রকম বলোতো ?

আমি: এই যেমন ধরুন, আপনি তো সুন্দরী, শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী ছিলেন। তা হ'লে কেন আপনি এক অন্ধ রাজপুত্রকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন ? যতদূর জানি তখনকার দিনে নারীরা তো অবলা ছিলেন না, স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল।

গান্ধারী: একটা কথা বলি শোন, তোমাদের এই কলি যুগের মতো দ্বাপর যুগেও দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার ছিল। সেকালে প্রবল প্রতাপশালী রাজ্য ছিল হস্তিনাপুর। ভাশুরঠাকুর ভীষ্মদেব আমার শ্বশুর ও খুড়শ্বশুরের জন্য যেভাবে কাশী রাজকন্যাদের সবলে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল সর্বজনবিদিত। গান্ধার তো হস্তিনাপুরের তুলনায় ছোট একটা রাজ্য ছিল, আমার বাবা এই বিয়েতে মত না দিলে কি যে হতো বলা যায়না, হয়ত যুদ্ধই লেগে যেত একটা, সেই ভেবে বাবার কথা চিন্তা করে আমার আর আপত্তি করবার কোন রাস্তাই ছিলনা।

আমি: কিন্তু ভারতবর্ষে তো তখন আরও অনেক রাজ্য ছিল, রাজকন্যারও অভাব ছিলনা, তা হ'লে না দেখে শুনে হঠাৎ ভীষ্মদেব আপনার বাবা সুবল রাজার কাছে কেন প্রস্তাব পাঠালেন ? তার কি কোন কারণ ছিল ?

গান্ধারী: আমার তো মনে হয় ছিল। তবে হলফ করে বলতে পারবোনা। ছোটবেলা থেকেই আমার খুব পুত্র সন্তানের শখ ছিল। মহাদেবের কাছে তপস্যা করে শতপুত্র লাভের বর পেয়েছিলাম। মনে হয় কোন ভাবে এই খবরটা হস্তিনাপুরে পৌঁছেছিল। অতীতের কথা ভেবে কুরুবংশের বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে এই বরটি কাজে লাগারই কথা।

আমি: আমার এর পরের প্রশ্নটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কেন আপনার ভবিষ্যত স্বামী, অন্ধ জানার সঙ্গে সঙ্গে পট্টবস্ত্র দিয়ে নিজের চোখ দু'টি ঢেকে ফেললেন ? আপনার কি একবারও ইচ্ছে করলনা যাকে চির জীবনের সাথী করে নিচ্ছেন, তাকে, আর যে বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটাতে যাচ্ছেন তা' একবার অন্তত স্বচক্ষে দেখবার? তা'ছাড়া আমার মনে হয় আপনি স্বেচ্ছাকৃত অন্ধত্ব বেছে না নিলে হয়ত আপনার স্বামী আপনার চোখের আলোতে পৃথিবীটা অন্য ভাবে দেখতে পারতেন।

গান্ধারী: এটা সত্যি একটা কঠিন প্রশ্ন। বলাবাহুল্য আরও পাঁচজন বিবাহযোগ্যা মেয়ের মতো আমার কল্পনাতেও একজন সুপুরুষ এবং সর্বগুণ সম্পন্ন স্বামী পাবার স্বপ্ন ছিল। বাবার ও গান্ধার রাজ্যের মঙ্গলার্থে, অন্ধ স্বামীকে বরণ করে নিতে হবে ভেবে অভিমান যে হয়নি তা' বলতে পারিনা। মনে হয়েছিল চোখে কাপড় বেঁধে নিয়ে আমিও অন্ধকারে বাস করবো। এই সুন্দর পৃথিবী, নিজের রূপ যৌবন, বাবা মা, কোনকিছুই আমার দেখার দরকার নেই। মনে হয়েছিল এই ফাঁদ থেকে বেরোবার কোন রাস্তাই নেই। বিবাহের আগেই আমার শ্বশুরমশাই আমাকে "পতিব্রতপরায়ণা" বলে চিহ্নিত করে দিলেন। এই অভিমান নিয়েই হয়ত সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমার নীতিবোধ তা' করতে দিলনা। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যাঁর সাথে চিরজীবনের জন্য যুক্ত হতে চলেছি তাঁর সমব্যথী হয়ে থাকব। কখনো কোনভাবেই তাঁকে অতিক্রম করবোনা। আমি নিজেকে আমার স্বামীর সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। পরবর্তী কালে অবশ্য এ'ব্যাপারে আমার মনে দ্বিধা এসেছিল।

আমি: আচ্ছা আপনাদের বিয়ের ক'দিন পরই তো পাণ্ডুরাজ তাঁর দুই পত্নী, কুন্তী আর মাদ্রীকে নিয়ে আপনার স্বামীর কাছে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে বনবাসে চলে গিয়েছিলেন। আপনার স্বামী অন্ধ হয়েও কি ভাবে রাজ্য চালাতেন ?

গান্ধারী: আরে, রাজ্যতো চালাতেন আমার ভাসুরঠাকুর ভীষ্মদেব আর দেওর বিদুর। আমার স্বামী নামেই রাজা ছিলেন, অন্ধত্বের জন্য রাজ্য পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমি এ'সব কথা জেনেশুনেই বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্বামীকে রাজা না হতে পারার দুঃখটা গভীর ভাবে আঘাত করতো। উনি আশা করেছিলেন পাণ্ডুর আগে আমাদের ছেলে হবে আর সেই ছেলে ভবিষ্যতে সিংহাসন পাবে। আমিতো আগেই মহাদেবের কাছে শতপুত্র লাভের বর প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তারপর শ্বশুরমশাই যখন আমার আতিথেয়তায় খুশী হয়ে আমাকে বর দিতে চাইলেন, আমি আবার শতপুত্র চাইলাম। এবার এই প্রার্থনার সঙ্গে জুড়ে দিলাম আরেকটা শর্ত, পুত্র যেন আমার স্বামী প্রতিম হয়। হায়রে, না বুঝে লোকে যে কত কিছু প্রার্থনা করে বসে। শ্বশুরমশায়ের বরে যথাকালে গর্ভবতীও হলাম, সিংহাসন বঞ্চিত স্বামীকে বংশের প্রথম পুত্র উপহার দেবার আশায় আনন্দে মন ভরে উঠল। কিন্তু এক বৎসর পেরিয়ে যাবার পরও গর্ভ মুক্ত হতে পারলামনা। এদিকে হিমালয় থেকে খবর এলো কুন্তীর সূর্য্যসম তেজস্বী এক ছেলে হয়েছে। (এই বলে গান্ধারী চুপ করে থাকলেন।)

আমি: তারপর কি হলো বলুন।

গান্ধারী: তারপর? তারপর আমার শ্বশুরমশায়ের কল্পনার "দেবী গান্ধারী" মানুষ হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য, বুঝতে পারলাম স্বামীর মনোবাসনা পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা। রাগে, হিংসায় স্বামীর অগোচরে নিজের গর্ভপাতের চেষ্টা করলাম। শতপুত্রের পরিবর্তে বেরিয়ে এল লোহার মতো শক্ত, স্থুল এক মাংসপিন্ড। মনের দুঃখে আমি সেটাকে গোপনে ফেলে দিতে চাইছিলাম কিন্তু ধ্যানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে শ্বশুরমশাই এসে উপস্থিত হলেন।

আমি: পরিস্থিতি দেখে ব্যাসদেব নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ?

গান্ধারী: তা' আর বলতে, খানিক গালাগাল দেবার পর বল্লেন ওনার কথা মিথ্যে হবার নয়। আমি ওনাকে সব খুলে বল্লাম। নিজের মনে হিংসার উদ্রেকের কথাও বাদ দিলাম না। সব কিছু শুনে উনি সেই মাংসপিন্ডটি ঠাণ্ডা জলে ভেজাবার পর ওটা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম শতপুত্রের পর আমার যেন একটি মেয়েও হয়। শ্বশুরমশাই আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বল্লেন তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। একশটি ছেলের পর তোমার একটি মেয়ে হবে।

আমি: হঠাৎ মেয়ে চাইলেন যে ? কুরু বংশে তো এর আগে কারোকে কন্যা লাভের কামনা করতে দেখিনি।

গান্ধারী: আমি বিয়ের আগে থেকেই একটা সুন্দর সংসারের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আমার মনে হতো একটি মেয়ে না থাকলে যেন সংসারটা ঠিক সম্পূর্ণ হয়না। তা'ছাড়া আমি নিজের অতৃপ্ত বাসনা আমার মেয়ের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলাম।

আমি: সেটা কিরকম একটু খুলে বলবেন কি?

গান্ধারী: দেখ, আমিতো বিয়ের আগেই ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব বেছে নিয়েছিলাম। বিয়েকে কেন্দ্র করে একটি মেয়ের মনে কত রকম স্বপ্ন থাকে, সেটা তুমি বুঝবে, তুমি তো নিজেও একটি মেয়ে। ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যে যা' জোটেনি, আমার মেয়ের ভাগ্যে হয়ত তা' জুটবে অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন সুপুরুষ স্বামী পাবে।

আমি: ব্যাসদেবের তৎকালীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আপনার সন্তান লাভ হতে তো প্রায় দু'বছর লেগেছিল। এই সময় আপনার মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল ? মহাভারতের কবি কিন্তু এ'ব্যাপারে প্রায় নীরব।

গান্ধারী: আগেই বলেছি শ্বশুরমশাই প্রথম থেকেই আমাকে এক ধর্মশীলা নারী রূপে অঙ্কিত করবার জন্য মন স্থির করে ফেলেছিলেন তাই যখনই আমার নিজেকে একজন সাধারণ নারী রূপে ব্যক্ত করবার সময় এসেছে, দেখবে সেখানেই তিনি আমাকে নিশ্চুপ করে রেখেছেন। অবশ্য ন্যায়-নীতি বাচক কিছু কথা পরের পর্বগুলিতে আমার মুখেও শোনা যায়।

আমি: খুব জানতে ইচ্ছে করছে তখন আপনার কি বলার ছিল। আপত্তি না থাকলে একটু বলবেন কি ?

গান্ধারী: নিশ্চয়ই বলবো। এখন তো আমি সতীত্বের তকমা পেয়েই গিয়েছি। এতদিন পর নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে আর কোন বাধা নেই। প্রথমে অভিমান হলেও, আমি কিন্তু বিয়ের আগে সত্যি আত্মসুখের কথা চিন্তা না করে, চোখ বেঁধে আমার স্বামীর সমপর্যায়ে নেমে আসতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম স্বামীর ব্যথায় সমব্যথী হয়ে সতীর মত জীবন কাটাব কিন্তু প্রতিদানে আমি কি পেলাম? আমার গর্ভাবস্থায় সুধ্বা নামে এক দাসী আমার স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমার স্বামীর ঔরসে সন্তান সম্ভবা হন। যুযুৎসু সেই

সন্তান, আমার ছেলে দুর্যোধনের সমবয়সী। তোমার কি মনে হয় এই ঘটনা আমার মনে কোন রেখাপাত করেনি? শ্বশুরমশাই অবশ্য আমার চরিত্রকে পবিত্র রাখতে গিয়ে এধরণের পরিস্থিতি এড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু এখন বলতে বাধা নেই লজ্জায় অপমানে তখন আমার মাথা কাটা গিয়েছিল। যে স্বামীকে মনে প্রাণে আমি পতি রূপে পুজো করতে চেয়েছিলাম, তাঁর এই ব্যবহারে জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে যাওয়া ছাড়া তখন আমার আর কোন উপায় ছিলনা।

আমি: আচ্ছা, দুর্যোধন জন্মাবার পর নানারকম অশুভ ইঙ্গিত দেখা দিলে বিদুর যখন নবজাত শিশুটিকে বংশ রক্ষার জন্য পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন, তখন আপনার স্বামী প্রতিবাদ করলেও আপনি কিন্তু নিশ্চুপ ছিলেন।

গান্ধারী: তুমিই বলো, একটি মা কি তার বহুপ্রতিক্ষিত নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করতে পারে ? এই ব্যাপারে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সহমত ছিলাম। একটি নিষ্পাপ শিশুকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিয়ের আগে থেকেই যে মাতৃত্বের বর চেয়েছিল, তার পক্ষে কি এটা সম্ভব ? পরে যখন দুর্যোধনের ব্যবহার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন কিন্তু বিদুরের সাথে একমত হয়ে আমি তাকে নির্বাসন দিতে ইচ্ছুক ছিলাম।

আমি: স্বামীকে হারিয়ে কুন্তী যখন পিতৃহীন পাঁচ পুত্রের হাত ধরে হস্তিনাপুরে এলেন তখন আশা করেছিলাম আপনি কুন্তীর পাশে এসে দাঁড়াবেন।

গান্ধারী: সেটা করা হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম স্বামীকে কখনো অতিক্রম করবোনা। এই প্রতিজ্ঞা অনেক ব্যাপারেই আমার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি কিন্তু বিদুরের সাহায্য নিয়ে কুন্তী ও তার ছেলেদের, প্রাসাদে থাকবার সুব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম।

আমি: স্বামীকে অতিক্রম করবেননা বলেই কি আপনার ছেলেদের বাল্যাবস্থায় আপনি শাসন করতেন না ? ছেলেবেলায় দুর্যোধনের মধ্যে যে জেদ, অবাধ্যতা ও ঈর্ষার বিষ সঞ্চারিত হয়েছিল সেগুলিকে তো ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। এমন কি ভীমসেনকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দেবার পরওতো আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে শোনা যায়না, আপনার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তেজী মনের পরিচয় কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা পাইনা।

গান্ধারী: এখনকার যুগে তোমরা তো বেশ ভালই জান সন্তান পালনের ক্ষেত্রে বাবা-মা দু'জনেরই সমান ভূমিকা থাকা দরকার। আমিও সেটা জানতাম, আমার মতে শাসনের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সব সময় একমত হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্যোধনের জন্মের পর বুঝতে পেরেছিলাম আমার স্বামী শুধু জন্মান্ধই নন স্নেহান্ধও বটে। হিংসা ও লোভ সেই অন্ধ স্নেহের সাথে মিশে তাঁর মনকে কলুষিত করে ফেলেছিল। দুর্যোধনের কোন দোষই তিনি দেখতে পেতেন না। প্রতিবাদ করে কিছু লাভ হবেনা ভেবে আমি উদাসীন হয়ে থাকতাম। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার জন্য যে সন্তানদের মুখ দর্শন করিনি, তাদের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ আমার কিছু কম ছিলনা। বুঝতে পারছিলাম ছেলেরা, বিশেষ করে দুর্যোধন তার বাবার প্রশ্রয়ে অধর্মের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, ওর ভাগ্য কিছুটা অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলনা।

আমি: বহুদিন নীরব থাকবার পর আপনাকে আবার আমরা দেখতে পাই সভাপর্বে। কপট দ্যূতক্রীড়ার পর যখন দ্রৌপদীর মানহানি হয়, তখন কিন্তু আপনাকে আর উদাসীন থাকতে দেখা যায়না। তখন আপনি সভাস্থলে সর্বসমক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

গান্ধারী: গৃহের কুলবধূর অবমাননার পর কি আর উদাসীন থাকা যায় ? সেটা আবার ঘটেছিল আমার স্বামীর উপস্থিতিতে আমারই কুলাঙ্গার পুত্রদের দ্বারা। রাগে দুঃখে আমার অন্তরের নীরবতা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

একজন নারী হয়ে অন্য এক নারীর মর্যাদাহানি সহ্য করার মতো মেরুদণ্ডহীন আমি ছিলামনা। কন্যাসমা দ্রৌপদীর সঙ্গে নারীসত্ত্বার একাত্মতা অনুভব করেছিলাম বলেই সেদিন সভাস্থলে আক্রোশ প্রকাশ করতে দ্বিধা করিনি।

আমি: আমার মনেহয় সেদিন আপনার সোচ্চার প্রতিবাদেই আপনার স্বামী দ্রৌপদীকে বর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদুরতো প্রথম থেকেই প্রতিবাদ করছিলেন কিন্তু ওনার কথায় তো কোন কাজই হচ্ছিলনা।

গান্ধারী: কিন্তু আমার পক্ষে তো শেষরক্ষা করা সম্ভব হলোনা। আসলে আমার স্বামীকে প্রথমে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। ওনার মনে অন্ধত্ব ও সেই কারণে রাজা না হতে পারার দুঃখ ছিল ঠিকই, কিন্তু দুর্যোধনের জন্মের পর থেকে ওনার মনে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ কাজ করতে শুরু করেছিল। এখনকার যুগে হয়ত এটাকে তোমরা বলবে দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব। সুবুদ্ধির উদয় হলে, পাণ্ডবদের জন্য তাঁর মন বাৎসল্য রসে আপ্লুত থাকত, কিন্তু পুত্রের স্বার্থে সেই বাৎসল্য রস কলুষিত হতেও সময় লাগতনা। ওনার মানসিকতা অত্যন্ত দূর্বল প্রকৃতির ছিল। আমার মত পতিব্রতা নারীর মুখে এসব শুনে অবাক হচ্ছ নিশ্চয়ই। মহাকাব্যে তো আমাকে দিয়ে এরকম কিছুই বলানো হয়নি, তাই সুযোগ পেয়ে আজ বলেই ফেললাম।

আমি: ভালই করেছেন। ব্যাসদেব ওনার ইচ্ছে মতো আপনাকে কখনো নীরব আবার কখনো মুখর করেছেন আজ নিজের কথা বলতে পেরে আপনার ভাল লাগছে আশাকরি।

গান্ধারী: ভাল তো অবশ্যই লাগছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কতটাই বা নিজেকে প্রকাশ করার অবকাশ আছে বলো? এই সীমিত সময়ে অন্তরের ন্যায়বোধ ও চারপাশে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের সঙ্গে আমার সারা জীবনের সংগ্রামের কথা বর্ণনা করা কি সহজ?

আমি: তা'ঠিক, তবে আশা করছি আমার আসন্ন প্রশ্ন রাশির উত্তরে আপনি নিজেকে আরও কিছুটা ব্যক্ত করবার সুযোগ পাবেন। যথারীতি সুদীর্ঘ বিরতির পর আপনাকে আবার আমরা দেখতে পাই তের বৎসর পর উদ্যোগ পর্বে একদম রাজসভার মধ্যে।

গান্ধারী: হ্যাঁ, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে যাবার পরে পরিস্থিতি জানবার জন্য উপপ্লব্য নগরীতে সঞ্জয়কে দূত রূপে পাঠানো হয়েছিল। সঞ্জয় ছিলেন আমার স্বামীর সারথী, সহচর ও উপদেষ্টা। উনি ছিলেন বুদ্ধিমান, সৎ ও অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। সঞ্জয় ফিরে আসার পর আমার স্বামী যখন একান্তে তাঁর কাছে সমস্ত সংবাদ জানতে চাইলেন, বুদ্ধিমান সঞ্জয় বললেন, উনি রাজসভায় সর্বসমক্ষে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করবেন, একান্তে, নিরালায় নয়। সঞ্জয়ের অনুরোধে আমি আর আমার শ্বশুরমশাই সেই সভাতে উপস্থিত ছিলাম।

আমি: কিন্তু কেন বলুন তো? রাজসভায় সমস্ত রথী মহারথীদের মধ্যে সঞ্জয় হঠাৎ একজন কুলবধূকে উপস্থিত থাকতে বললেন কেন, আর কেনইবা ওনার বন্ধুকে একান্তে কিছু বলতে চাইলেন না?

গান্ধারী: আগেই বলেছি সঞ্জয় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। রাজসভায় দ্রৌপদীর অবমাননার পর আমার তীব্র প্রতিবাদের সাক্ষী ছিলেন তিনি। উনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার স্বামী সেই প্রতিবাদের ভাষায় নত হয়ে দ্রৌপদীকে বর দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া সঞ্জয় আমার স্বামীর মনে দ্বৈরথের কথা জানতেন, দুর্যোধনের প্রতি তাঁর দুর্বলতার বিষয়েও তিনি অবগত ছিলেন। দুর্বলচিত্ত হওয়াতে দুর্যোধন প্রসঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি ওনার মত পরিবর্তন হতো। তাই সঞ্জয় সর্বসমক্ষে ওনার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন।

আমি: ধৃতরাষ্ট্র তো সভায় দুর্যোধনকে "আপনার পুত্র" বলে সম্বোধন করছিলেন, এতে আপনার কেমন লাগছিল?

গান্ধারী: এটা তো চিরকালের নিয়ম। ছেলে যখন কোন ভাল কাজ করে, পিতারা গর্বিত হয়ে তাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন। কিন্তু সেই ছেলে যদি কোন কুকর্ম করে তখন পিতার কাছে সে মায়ের ছেলে হয়ে যায়। যে পিতার প্রশ্রয়ে দুর্যোধন দুর্দমনীয়, হয়ে উঠেছিল, তাকে তো তার পিতা, মায়ের ছেলে বলবেনই এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? মহাকাব্যে এই প্রথম আমাকে প্রকাশ্যে পুত্র শাসনের সুযোগ দেওয়া হ'লো, সভা গৃহে সকলের মাঝে আমি দুর্যোধনের সন্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলাম। যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম এতে বিশেষ ফল হবেনা, কিন্তু অবশেষে মহাভারতের কবি আমাকে যে এখানে আমার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে নিজের মনের কথা বলতে দিয়েছেন, তারজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমি: সেদিন আপনার বক্তব্যের কিছু অংশ কি আমাদের সাথে ভাগ করে নেবেন ?

গান্ধারী: কি আর বলবো, যখন দেখলাম ক্রুদ্ধ, উদ্ধত, অবাধ্য দুর্যোধন কারো কথাই শুনছেনা, তখন ওকে তিরষ্কার করে বললাম, লোভ, উচ্চাকাঙ্খা, ঐশ্বর্য্যকামনা তাকে সর্বনাশের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। সে যেদিন জীবনের সব ধন খুইয়ে ভীমসেনের হাতে মরণের সম্মুখীন হবে সেদিন গুরুজনদের কথার দাম সে বুঝতে পারবে। দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর অবমাননার পর ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলামনা। কিন্তু আমার তিরষ্কার উলু বনে মুক্তা ছড়ানোর মতোই হলো। মা হয়েও আমি দুর্যোধনের অসৎ চিত্তে কোন পরিবর্তন আনতে পারলামনা।

আমি: আপনি এ'নিয়ে মন খারাপ করছেন কেন ? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণওতো দ্যূত রূপে এসে আসন্ন মহাযুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন।

গান্ধারী: আসল ব্যাপার কি জান? মাটি যখন নরম থাকে তখনই তাকে নানা আকারে গড়া যায়, কুমোরের হাতে একবার সেটা পাত্রে পরিণত হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকেনা। দুর্যোধনের অবস্থাও সেরকমটাই হয়েছিল। এটা লক্ষণীয় সারাজীবন পিতার অন্ধ স্নেহে পালিত হয়ে যখন সে অদম্য, অবাধ্য, উদ্ধত হয়ে যুদ্ধের জন্য মেতে উঠেছে, ঠিক তখন তার পিতার মনে হলো, পুরো ব্যাপারটার জন্যই দায়ী আমি। শ্রীকৃষ্ণর শান্তি প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে দুর্যোধন যখন সদলবলে সভা ছেড়ে চলে গেল, তখন তাকে ফিরিয়ে এনে বোঝাবার ভার পড়লো আমার ওপর।

আমি: আপনার কি মনে হয় আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়েছিলেন ? হয়ত ভেবেছিলেন দুর্যোধন একমাত্র আপনার কথাই শুনবে ?

গান্ধারী: ভীত অবশ্যই হয়েছিলেন, বুঝতে পারছিলেন এই যুদ্ধের ফলাফল ভাল হবেনা। কিন্তু স্নেহান্ধ, দুর্বলচিত্ত পিতার পক্ষে তাঁর অদমনীয় ক্রুদ্ধ পুত্রকে বশে আনা অসম্ভব ছিল। একমাত্র ধর্মের পথ অর্থাৎ পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়া লোভাতুর পিতা, পুত্রের চিন্তার অতীত ছিল। শ্রীকৃষ্ণর উপস্থিতিতে সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে আমার স্বামী আমাকে ডেকে এনে দুর্যোধনকে তিরষ্কার করতে বললেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন তখন তার অনুচরবৃন্দ দের নিয়ে সভা ত্যাগ করেছে। এই সময় আমি আমার স্বামীকে কিছু ন্যায় বাক্য শোনাতে দ্বিধা করলামনা। এতদিন আমার যে মিনতি স্বামী, পুত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল,সেদিন আমি তা' সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করলাম। ধর্মভ্রষ্ট পিতা-পুত্রের মাঝখানে পড়ে নিজের ন্যায়-নীতি বাঁচিয়ে রাখার যে সংগ্রাম, আমার মুখ থেকে দাবানলের মতো তা' বেরিয়ে এলো।

আমি: মহাকাব্যের কবির লেখনীতে আপনার এই তেজস্বিনী রূপ আমাদের মুগ্ধ করে।

গান্ধারী: একজন অন্ধ মানুষের ওপর প্রতিজ্ঞাসুত্রে এবং কিছুটা মায়াবশত অনেক অন্যায় সহ্য করবার পর আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলোনা। স্বামীকে বললাম, তাঁর এই অসভ্য, অপদার্থ ছেলেকে তো সব

জেনেশুনেই তিনি রাজ্য দান করেছেন। এই ছেলের সমস্ত অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন। তাঁরই প্রশ্রয়ে দুর্যোধন আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, সেখান থেকে তাকে ফেরানো সম্ভব নয়। যে ছেলে মূর্খ, মূঢ় ও লোভী, যে বদলোকেদের সাথে মেশে, তার হাতে রাজ্য তুলে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল? তারই ফল আজ ভোগ করতে হচ্ছে। আত্মীয়দের সাথে বিভেদ মেটানো কি যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব ছিলনা ?

আমি: ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে বিদুর দুর্যোধনকে সভাস্থলে নিয়ে আসার পর কি হলো ?

গান্ধারী: কি আর হবে ? আগেই তো বলেছি, বুদ্ধিভ্রষ্ট দুর্যোধনকে অন্যায়ের পথ থেকে ফেরানোর আর কোন উপায় ছিলনা। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনেও আমি ওকে সুবুদ্ধি দিতে চেষ্টা করলাম। তাকে তার পিতা সহ অন্যান্য গুরুজনদের কথা শুনতে অনুরোধ করলাম, বললাম ইচ্ছে করলেই লোকে রাজ্য পায়না, কেউ ইচ্ছে করলে রাজ্য রক্ষাও করতে পারেনা। বোঝাতে চাইলাম, হস্তিনাপুর রাজ্য সে তার পিতার পৃষ্ঠপোষকতায় পেয়েছে, সেখানে তার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই, সেই রাজ্য ভোগ করার অধিকারও তার নেই। যে সমস্ত রাজা কাম, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ভাবে প্রজাপালন করা অত্যন্ত কঠিন। দুর্যোধনকে এও বললাম যে, পাণ্ডবদের শত্রু রূপে বিবেচনা করার আগেএকবার যেন সে তার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে ও তার অন্তরের শত্রু, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ দমন করতে চেষ্টা করে। আত্মীয়ের সাথে যুদ্ধের ফল কখনো ভাল হয়না, বিশেষ করে তারা যখন কোন অন্যায় করেনি। পাণ্ডবরা বীর এবং বুদ্ধিমান তাদের সাথে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করলে সকলে মঙ্গল হবে।

আমি: আচ্ছা, আপনার এত উপদেশ শোনার পর দুর্যোধনের কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি ?

গান্ধারী: তা যদি হতো, তাহলে মহাভারত অন্য ভাবে লেখা হতো। পাণ্ডবদের ওপর দুর্যোধনের অন্যায় অত্যাচার আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। কোন ফল হবেনা, ভেবে আগে প্রকাশ্যে স্বামীপুত্রের উচ্চাকাঙ্খার প্রতিবাদও করিনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এই যুদ্ধের ফল হবে মর্মান্তিক। দুর্যোধনের উচ্চাভিলাষের আগুনে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার ছেলের কাছ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখেও আমি চুপ করে না থেকে বলেই যেতে লাগলাম আমার মনের কথা। যুদ্ধের পরিণতির কথা ভেবে বললাম, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনীর তুলনায় অর্জুন, ভীম, কৃষ্ণ অনেক শক্তিশালী। বিশেষ করে কৃষ্ণ যাদের সহায় তাদের হারানো অসম্ভব। ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্যরা কৌরবদের হ'য়ে যুদ্ধ করবেন ঠিকই কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহ বশতঃ এনারা কখনোই তাদের শত্রু রূপে ভাবতে পারবেন না। কাজেই আসন্ন যুদ্ধে জয়লাভের আশা করাও দুর্যোধনের ধৃষ্টতা। পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ, তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করে নেওয়াই সমীচীন, এতে সকলের কল্যাণ হবে, পৃথিবীও বীরশূন্যা হবেনা।

আমি: দুর্যোধনতো আপনার অথবা অন্য কোন শুভাকাঙ্খী গুরুজনদের এমন কি শ্রীকৃষ্ণের কথায় কান না দিয়ে যুদ্ধে নামলেন। দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর শঙ্কা সত্যরূপে প্রকাশিত হলো। মহাভারতের কবির লেখনী যখন যুদ্ধের বিভিন্ন বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিল, এই যুদ্ধে যারা সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, সেই অভাগিনী নারীদের অবস্থা বর্ণনা করবার সময় বোধহয় তাঁর তখন ছিলনা। আপনাকে আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধের শেষ দিনে। কর্ণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আপনাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে আমি কিন্তু অবাকই হয়েছিলাম। কর্ণকে তো চিরকাল আপনি দুর্যোধনের কুসঙ্গ বলে ভাবতেন, তার মৃত্যুতে আপনার এত শোকাকুল হওয়ার কি কোন কারণ ছিল ?

গান্ধারী: কর্ণকে সত্যি আমি পছন্দ করতাম না। ওর মনেও দুর্যোধনের মতো হিংসার বিষ ছিল। কিন্তু ও যে বন্ধুবৎসল আর বীর যোদ্ধা ছিল সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় ছিলনা। বিদুরের উপদেশে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ

করতেও আমার আপত্তি ছিলনা। কিন্তু সন্তানের মৃত্যু কোন মা চায় বলো ? আমার মায়ের মন জানত, কর্ণ নিজের প্রাণ দিয়েও দুর্যোধনকে রক্ষা করবে। তাই যখন শুনলাম কর্ণ মারা গিয়েছে তখনই বুঝতে পারলাম আমার দুর্যোধনেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। পুত্রের আসন্ন মৃত মুখ দেখবার শঙ্কা আমাকে বিচলিত করেছিল।

আমি: মহাভারতের যুদ্ধের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার ক্রোধের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন বলুনতো ? আপনিতো জানতেন ধর্মের জয় হয়েছে। যুদ্ধের ফলাফল দেখে আপনার দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ক্রোধ হবে কেন ?

গান্ধারী: তুমি তো জান আমি শতপুত্র লাভের আশায় দুবার দুজনের কাছে বর প্রার্থনা করছিলাম। শতপুত্রের মৃত্যুশোকে আমার চিরাঙ্খিত মাতৃধর্ম, নৈতিক ধর্মবোধকে অতিক্রম করেছিল, আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। তপস্যার আগুনে গোটা পৃথিবী পুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আমার ছিল। শ্বশুরমশাই এব্যাপারে অবগত ছিলেন তাই সময়মত যুক্তির সাহায্যে আমার ক্রোধ প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্বশুরমশায়ের উপস্থিতি শেষপর্যন্ত আমাকে ধর্মসংকটে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল। পুত্রশোকে আমি যখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাণ্ডবদের অমঙ্গল চাইছিলাম, তখন পরম স্নেহভরে শ্বশুরমশাই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এটা অভিশাপ দেবার সময় নয়, এটা ক্ষমা করার সময়। উনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে, আমার পুত্রেরা আশীর্বাদ চাইতে এলে আমি ওদের বলতাম, "যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়", আমার কথা অনুযায়ী ধর্মেরই তো জয় হয়েছে। ওনার কথা শুনে আমার মনে হলো সত্যি আমি তো কখনো আমার পুত্রদের বলিনি "জয়ী হয়ে ফিরে এসো"। দুর্যোধনকে আশীর্বাদ করে বলতাম, সাবধানে থাকতে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করতে, কিন্তু কখনোই জয়ী হতে নয়। ধর্ম, অর্থাৎ নীতিবোধের কাছে নতি স্বীকার করতে আমার বাধতো। শ্বশুরমশায়ের কথায় আমার সেই নীতিবোধ ফিরে এল। নিজের মনকে শান্ত করে যুধিষ্ঠির আর ভীমসেনকে ক্ষমা করতে সক্ষম হলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আমাদের সেই দুর্দিনে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমার রাগ প্রশমিত করতে চেষ্টা করছিলেন।

আমি: তবুও আপনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন কেন ?

গান্ধারী: কুরুক্ষেত্র রণস্থলের কল্পনাতীত বীভৎস পরিস্থিতি দেখার পর আমার পক্ষে আর নিজেকে স্থির রাখা সম্ভব ছিলনা। চারিদিকে আত্মীয় পরিজনদের হাজার হাজার মৃতদেহ, স্বামীপুত্র হারা পুত্রবধুদের বুকফাটা আর্তনাদ, অন্যায় ভাবে নিহত পুত্র দুর্যোধনের মৃতদেহ, এসব দেখে তোমাদের মহাভারতের কবি বর্ণিত "ধৈর্য্যশীলা গান্ধারী" আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। জ্ঞান ফেরার পর সামনেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আমার সব রাগ গিয়ে পড়ল ওনার ওপর। মনে হলো ইচ্ছে করলেই উনি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতেন। উনি তো ভগবান, ওনার পক্ষে তো সবই সম্ভব। কিন্তু তা'তো তিনি করলেনই না, উপরন্তু মহাযুদ্ধে অনেক সময় পাণ্ডব পক্ষকে অন্যায় ভাবে সাহায্য করেছেন। ওনার সহায়তা না পেলে কি আমার দুর্যোধনকে ভীমসেন এমন অন্যায় ভাবে মারতে পারত, আমার মেয়ে কি স্বামীহারা হতো ? একশোটির মধ্যে আমার একটি পুত্রকেও কি বাঁচানো যেতনা ? তারা কি সকলেই দুর্যোধনের মতো পাপী ছিল ? এই সব প্রশ্ন আমার মনে ভীড় করে আসছিল। মনে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণই দোষী, উনিই আমাকে শতপুত্রের কণ্ঠের মা ডাক থেকে বঞ্চিত করেছেন।

আমি: কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতো নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধ বন্ধ করবার। শান্তির আশা নিয়ে নিজে দূত রূপে এসেছিলেন হস্তিনাপুরের রাজসভায়, আপনি তো সেই সভায় প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সবই দেখেছিলেন। আপনি কি করে এসব কথা ভুলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দোষী সাব্যস্ত করলেন ?

গান্ধারী: তোমাদের অবাক লাগাবারই কথা। বিশেষত মহাভারতের কবি-অঙ্কিত গান্ধারী যে সর্ব ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ এক রমনী, তার পক্ষে এই ধরনের ব্যবহার তো অকল্পনীয়, সে ধৈর্য্যশীলা, ধর্মপরায়ণা। কিন্তু সদ্য পুত্রহারা মায়ের অন্তরের শোকের সাগরে তো যুক্তি, তর্ক, নীতিবোধের কোন স্থান থাকা সম্ভব নয়। ধর্মবোধের অন্তরাল থেকে মাতৃত্বের শোক আমার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল যে ব্যক্তির ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় আজ আমি পুত্রহারা হয়েছি, শুধু পুত্রই বা বলি কি করে, পুরো কুরুকুলই ধ্বংস হয়ে গেল, তাঁরও যেন আমার মত অবস্থাই হয় অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের মাধ্যমেই যেন যাদব বংশও ধ্বংস হয়।

আমি: শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু হাসিমুখে মাথা নত করে আপনার অভিশাপ গ্রহণ করেছিলেন।

গান্ধারী: সেটা একমাত্র সর্বংসহ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব। তা'ছাড়া যাদব বংশের ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে অজানা ছিলনা। তার জন্য আমার অভিশাপের কোন দরকারই ছিলনা। কিন্তু এই অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় আমাকে শোকমুক্ত করবার জন্য ভগবান কৃষ্ণের অকপট বাক্য আমার নিজের ভুল ভাঙতে সাহায্য করেছিল। তিনি আমাকে আমার সারা জীবনের ভুল ত্রুটির কথা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, মৃতের জন্য শোক করা মানে বিনষ্ট অতীত নিয়ে শোক করা, দুঃখের ওপর দুঃখ ভোগ করার কি কোন অর্থ আছে ? শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছিলেন, ক্ষত্রিয় রমণীরা তো ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু লাভ করবে জেনেই গর্ভলাভ করে। তাঁর কথা শুনে আমার ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং আমি নীতিগত ভাবে এই মহাযুদ্ধের বিশ্লেষণ করতে পেরে মনকে শান্ত করতে পারলাম। তোমাকে সব খুলে বলতে পেরে খুব আনন্দ পেলাম। আশাকরি এই আলোচনার মাধ্যমে আমি তোমার সংশয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারলাম।

আমি: আপনার এই সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সমৃদ্ধ হলাম। এরজন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আপনি আপনার জীবন দিয়ে মাতৃত্ব ও নৈতিক চরিত্রের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। ধর্মশীলতা অর্থাৎ নীতিবোধ সারা জীবন আপনার অন্তরে অনির্বাণ দীপশিখার মত জ্বলেছে আর সেটাকে বাইরের সমস্ত বিপরীত স্রোতের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস ছিল আপনার জীবনের পরীক্ষা। তপস্যা ও মাতৃত্ব এই দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দেবী গান্ধারীর চরিত্রের দীপ্তি আজও আমাদের আলোক প্রদান করে চলেছে।

Jay Banerjee

Remembering Grandma

'While working on this artwork I realized I really don't know what my grandma looked like. In a way that I could find her in a room but I couldn't tell you if she had a sharp or round nose or if her eyes were more close together or far apart. Studying her face and drawing her really helped to solidify her face in my memory. Which is really important to me because I do not want to forget her.'

তনিমা বসু

সরলরেখা

দিদা শ্রীমতি রেখা বসু নাম রেখেছিল সৃজা – সৃজন করে যে । সৃজা পৃথিবীতে আসার আগেই আমার মা নামটা ঠিক করেছিলেন । আজ তার চোদ্দ বছর পরে সৃজা দিদুনের পোর্ট্রেট পেন্সিল দিয়ে এঁকেছে। দিদুনের স্মরণ সভায় সৃজার শ্রদ্ধার্ঘ্য। দিদুনের সাথে ছোটো বেলায় সময় কাটিয়েছে। কিন্তু দিদুনের সাথে আজকাল আর দেখা হয় না গত চার-পাঁচ বছর। কোভিড এসে আসা যাওয়া বন্ধ হল। তারপরে দিদুন আকাশের তারা হয়ে যায়। সৃজার কথায় দিদুনের প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে ওর উপলব্ধি হয়েছে যে দিদুনের মুখের কোন অংশে কি আছে ও সেগুলোর নিখুঁত বিবরণ ওর মধ্যে গেঁথে আছে যেটা হয়তো সেভাবে ওর মনে থাকতো না শুধু দিদুনকে একটা ঘরে পাশে দেখলে। সৃজা দিদুনকে এই ভাবে আবিষ্কার করলো আঁকার মধ্যে দিয়ে সেটা ওর মনে চিরস্থায়ী হবে। খুব সতর্কতার সাথে মুখের আদল এঁকেছে। দিদুনের অশক্ত হাত চায়ের কাপ ধরেছে সেটাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রিউমেটোইড আর্থারাইটিস এর উপস্থিতি ।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। এক সরল রেখার জন্ম লগ্ন তার কিছু বছর পরে স্বাধীন ভারত বর্ষের বাঁকুড়া শহরে। জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে মা হারিয়ে যায় না ফেরার দেশে। তিন দিদি, দুই দাদা ও এক ভাইয়ের মাঝে সে রেখার একটু একটু করে জীবনকে বুঝতে শেখা।

তাঁর বাবা, সেই স্বাধীনতা উত্তর যুগের মানুষ ছিলেন দূরদর্শী ও আধুনিক মনস্ক। মা হারা ছেলে-মেয়েদের জন্য নতুন মা আনার আবদার বা দাবী এসেছিল এদিক ওদিক থেকে। কিন্তু তিনি এক হাতে সকলকে বাবা ও মায়ের ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন। আমার দাদুর আদি বাড়ি বর্ধমানে। কিন্তু তিনি বড় হয়েছেন রাঁচিতে। মানভূম ডিস্ট্রিক পুলিশ অফিসার হিসেবে নিজের ক্যরিয়ার শুরু করেন। শোনা যায় তিনি খুব জাদরেল অফিসার ছিলেন। কিন্তু তিনি বাড়িতে সময় দিতেন সমান ভাবে। রান্না করতে ও সকলকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। বাড়িতে রান্নার ও কাজের লোকরা নিজের আপন জনের মতো স্নেহ পেতো তার কাছে। বেশ নাম ডাক ছিল তাঁর চারিদিকে ।

তিনি ছেলে ও মেয়েদের সমান ভাবে পড়াশোনা করিয়েছেন। আমার মায়ের ওপরের মাসি অঙ্কে খুব ভালো ছিলেন। তখন হাই স্কুল কোএডুকেশন। অ্যাডভান্স অঙ্কের ক্লাস নিতো না আর কোনো মেয়ে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের কথা। তখন মানভূম ডিস্ট্রিক্ট আর পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট আলাদা হয়নি। ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত হয়। দাদু এক সময় পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট টাউন ও আরো অন্য জায়গাতে পোস্টেড থাকার পরে আমার মায়ের হাই স্কুলের সময় রঘুনাথপুরে আসেন। রঘুনাথপুর জয়চন্ডী পাহাড়ে ঘেরা এক মালভূমির মধ্যে সাবডিভিশনাল শহর পুরুলিয়া জেলাতে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে আরো টিলা ও পাহাড়। ছোট নদ-নদী। লাল মাটির দেশ। বসন্ত কালে পলাশ ফুলে চারিদিক সেজে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশের শুটিং হয়েছিল এই পাহাড়ে। এখন বেশ পরিচিত জায়গা পর্যটকদের কাছে।

সেখানে জি ডি ল্যাং ইনস্টিটিউশন হাই স্কুল ছিল। ১৯০৩ সালে জেলা কালেক্টর ল্যাং সাহেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে তারও আগে ১৮৬৮ সাল থেকে মিডল স্কুল হিসেবে স্কুলে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল পুরুলিয়ার এক ছোট শহরে প্রাক স্বাধীনতা যুগে। পুরুলিয়া মানে অনেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা ও মাওবাদীর কথা ভাবেন। ইতিহাস ও বর্তমান কিন্তু তা বলে না। যাই হোক, আবার কথায় ফিরে আসি। এই স্কুলে মাসি, মা ও ছোটো মামা পড়েছেন। আমার মা যখন হাই স্কুল শেষ করেন সেই বছর রঘুনাথপুর কলেজ খোলা হয় (১৯৬১)। তার আগে যারা কলেজে পড়েছেন এই অঞ্চল

থেকে তাদের হয় বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজ (১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) বা পুরুলিয়া জে কে কলেজে (১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) পড়তে হতো। মায়ের সময় রঘুনাথপুর কলেজে শুধু মাত্র আর্টস সেকশন থাকায় মা আর্টস নিয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী করেন । কিন্তু মা স্কুলে টিচার হিসেবে ভালো অঙ্ক পড়াতেন।

মায়ের আরেক ভালো লাগার বিষয় ছিল ফিজিক্যাল এডুকেশন। মা সেই সময় ট্রেনড ছিলেন ফিজিক্যাল এক্টিভিটিস্-এ। মেয়েবেলা থেকে ম্যারাথন, হার্ডল রেস, শর্ট পুট ও খো খো, কবাডি সব দিকে নিজের ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছে। দাদু মেয়েকে বাড়ির রান্না বা ঘর সাজানো না শিখিয়ে মাঠে পাঠিয়ে দিতো ছেলেদের সাথে। মনে রাখতে হবে সময়টা কিন্তু ১৯৬০ -১৯৭০। মায়ের এত নেশা ছিল খেলার মাঠে যে মায়ের কড়ি আঙ্গুলের নখ বার বার উপড়ে যেত। স্পোর্টস জুতো পরে খেলার কথা ভাবা যায় না সেই সময়। তারা খালি পায়ে কাবাডি বা খো খো খেলছে। জোরে ছুটতে গিয়ে আঙ্গুলে চোট পেয়েছে। খেলার আনন্দে এত মশগুল যে আঙ্গুলের ব্যথা কিছু দাগ কাটেনি। পরে বাড়ি এসে দেখছে নখ উড়ে গেছে। এভাবে বার বার হবার ফলে আর নখ নতুন করে গজায়নি সেখানে। আমি দেখেছি মায়ের নখ না থাকা পায়ের কড়ি আঙ্গুল। কিন্তু তার জন্য কোনো আফসোস ছিল না মায়ের। বরঞ্চ এই গল্প বলার সময় দেখতাম কত খুশির আভাস চোখে মুখে।

মা সব কম্পিটিশনে প্রথম হতো। শোনা কথা, মায়ের থার্ড ইয়ার কলেজ যখন, সেবার আদ্রার সকলে মা'কে নমস্কার করে বলে যে এবার আমরা হয়তো চান্স পেতে পারি ফার্স্ট প্রাইজ পাবার জন্য। রেখাদি থাকলে কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারবো না যে আমরা ফার্স্ট প্রাইজ পাবো। একই কথা শোনা যায় মায়ের হাই স্কুলের বন্ধুদের থেকে। মা কোএডুকেশনে পড়তো বলে মায়ের ছেলে বন্ধু বেশি। সেই সময়কালে সেটা বেশ আধুনিকতার পরিচয়। আমার বেড়ে ওঠার সময়ও দেখেছি আমার অনেক মেয়ে বন্ধুর বাড়িতে ছেলে বন্ধুদের সাথে মেলামেশাকে ভালো চোখে দেখা হত না। আমার কাছে সেটা সহজ ব্যাপার ছিল যদিও আমার হাই স্কুল গার্লস। কিন্তু বাড়ির পরিবেশ উন্মুক্ত ছিল। সেখানে যেমন ছেলে মেয়ে বিভেদ ছিল না, তেমনি ছিল না জাত পাতের বিভেদ, বা বড়ো লোক ছোটো লোকের বিভেদ। ছিল না অন্য কাপের ব্যবস্থা অন্য ধর্মের মানুষের জন্য।

মায়ের বিয়ে দিতে হবে সে নিয়ে দাদুর মাথা ব্যথা ছিল না সেরকম। দূরদর্শী পুলিশ ইন্সপেক্টর তার জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন মনে হয় যে এই মেয়ে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো নয়। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। সে নিজের দায়িত্ব নিজে সামলাতে পারবে। সেই সময় আমাদের অঞ্চলে একটা গার্লস হাই স্কুল তৈরী হয় (১৯৫৭)। মা কলেজ পাশ করে হাই স্কুল টিচার হয়ে যান। তারপরে ফিজিক্যাল এডুকেশন ট্রেনিং করেন। সেইসময় মা লেডি ব্রেবোন কলেজে এসে ভলিবল খেলার ট্রেনিংও নেন। একাধারে যেমন ৫০০ মিটার রান বা ম্যারাথন রান করতে পারতেন তেমন কাবাডি/খো-খো'র মাঠ জয় করতেন নিজের ক্ষমতায়। শারীরিক গঠন ছিপ ছিপে। মাঝারি লম্বা। কিন্তু খেলার টেকনিক সব নখদর্পনে। মাঠে যারা মা'কে সেই সময় দেখেছেন তারা বলেন – "তোর মা সব সময় ট্রফি নিয়ে ফিরত। আর যেভাবে মাঠে রাজ করতো সেটা দেখা আরো বড়ো প্রাইজ ট্রফির থেকেও।"

দীর্ঘদিন খেলার মাঠে সময় কাটানোর দরুন ভেতরে এক অদম্য জেদ ছিল জীবনের প্রতি। মানুষটি কখনো থেমে থাকেনি জীবনের যুদ্ধে। সব সময় অন্যের পাশে দাঁড়িয়েছে যেমন ভাবে ক্যাপ্টেনকে টিমের অন্য খেলোয়াড়দের পাশে থাকতে হয় লাস্ট মুহূর্ত অবধি। এমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে যারা হয়তো কখনো মায়ের পাশে দাঁড়াতে পারবে না সেটা জেনেও নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। কখনো দেওয়া নেওয়ার অঙ্ক কষে কাজে নামতো না। নিষ্কাম কর্ম করে গেছে আজীবন। স্কুলে নতুন কোনো দিদিমনি যোগ দিলে তাকে সহজে কাছে টেনে নেয়া থেকে, আত্মীয় বা পরিচিত কারও মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা সাহায্য করা। কারও বা ব্যাংক এর কাজে বা স্কুল অ্যাডমিশনে সাহায্য করা। বিশেষত যারা পিছিয়ে পড়েছে কোনো ভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সারা জীবন। যে আত্মীয় হয়তো আর্থিক ভাবে বেশি সচ্ছল

অন্য সকলে বেশি বেশি করে তাদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু মা'কে সে ব্যাপারে নিউট্রাল থাকতে দেখেছি। নিজের আত্মসম্মান তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান ।

আমি মা'কে পেয়েছি আমার হাইস্কুল টিচার হিসেবে। মা আমার প্রথম শিক্ষক যা কিছু শিখেছি তার হাতে খড়ি মায়ের কাছে। বাড়িতে মা বলে ডাকা আর স্কুলে দিদিমনি। আমরা টিচারদের ওই নামে ডাকতাম। টিচার'স কমন রুমে গেলে অন্যরা আমায় নিয়ে মজা করত। স্কুল অন্তপ্রাণ ছিল শেষদিন পর্যন্ত। মা স্কুলে শুধুমাত্র যে পড়াতেন বা খেলার ক্লাস করতেন তা নয়। অফিসের অনেক কাজ দায়িত্ব নিয়ে করত। মা'কে অনেকে ভয় পেতো রাগী বলে। কিন্তু তার সাথে যারা আন্তরিক ভাবে মেলামেশা করেছে তাদের কাছে মা চিরদিন পাশের মানুষ হিসেবে থেকেছেন। আমাদের স্কুলে সিডিউল ট্রাইবদের জন্য হোস্টেল ছিল। জেনেরালি ওই মেয়েরা সুযোগ ও সুবিধা পেলে খেলা ধুলা ভালো করতে পারে। মা ওদের ভালো করে ট্রেনিং দিত। স্কুলের পরেও সময় দিত। মেয়েরা জেলা স্তরে উত্তীর্ণ হত। তারপরে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করে ট্রফি আনতো। ওরা অনেক সময়ই লেখাপড়া অত ভালো করতে পারতো না। কিন্তু খেলায় ভালো ফল করতে করতে ওদের ভেতরে পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ বাড়লো। অন্যদিকে আমার মায়ের কাছে অঙ্ক শিখে অনেক ছাত্রী তাদের অঙ্ক-এর ভীতি কাটিয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে। সে গল্প আমি জেনেছি আমার স্কুলের দিদিদের থেকে। মা আমার ভাইকে গল্প করে করে পড়া মুখস্থ করিয়ে দিত এমন ভাবে যে ভাই খেলার ছলে সব শিখে নিত কম সময়ে। এমনকি হাই সেকেন্ডারি কমার্স সাবজেক্ট মা সহজে পড়িয়ে দিত ভাইকে। আমাদের দুই ভাই বোনকে মা কখনো অযথা বকুনি দিতেন না। ক্লাসে ফার্স্ট হতে হবে এরকম কখনো বলেননি। বাবা কাজের সূত্রে দূরে থাকতেন। শনিবার বাড়ি আসতেন আবার রবিবার বিকেলে চলে যেতে হত। তাই মা সেই যুগে সিঙ্গেল মা হিসেবে চার জন কে মানুষ করেছেন। কখনো কোনো কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। আমরা যা আনন্দ করে করতে চেয়েছি তাই করতে দিয়েছেন। আমার ম্যাথ অনার্স থেকে ফিজিক্স অনার্স পরিবর্তন করা মা পাশে না থাকলে হতো না। আর ফিজিক্স না পড়তে আসলে আমার সাথে দেবের দেখা হত না।

আমি মা'কে খেলার মাঠে ছুটতে দেখিনি। মা'কে দেখেছি আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন ক্লাস নেবার সময়। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন সব ছাত্রীরা লাইন করে দাঁড়াতো। মা ঠিক ধরে ফেলতো কেউ যদি ঠিক করে না ড্রিল করতো। মায়ের মাঠের সাথে এক অন্য কানেকশন। তখন পৃথিবীর অন্য দুঃখ কষ্ট সে ভুলে যেত। ছাত্রীরা কোনো বাহানা করলে খুব রাগ করতো। মা সব সময় বলতো নিজের ১০০% দিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে। পালিয়ে গেলে চলবে না। তোমায় লড়াই করে যেতে হবে। দুর্বল হলে চলবে না। আমি দেখেছি কিভাবে মা সাবডিভিশনাল স্পোর্টস ফাইনাল কন্ডাক্ট করত। আমি মায়ের সাথে শীতের নরম রোদ গায়ে মেখে সারাদিন মাঠে থেকেছি। আমাদের ওদিকে অনেক অনেক গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল আছে। নানা গ্রাম ও অঞ্চল থেকে তাদের ফাইনাল পার্টিসিপেন্টসরা আসতো সাবডিভিশনাল ফাইনালে যোগ দিতে। বেশির ভাগ স্পোর্টস টিচার আমাদের ওদিকে তখন ছেলে। মা আর এক মাসি, মেয়ে স্পোর্টস টিচার। আমার খুব গর্ব হত সেটা দেখে। আজ আরো বেশি গর্ব হয়। যখন দেখি আজও মেয়েরা এক চাকরি করে সমান স্যালারি পায় না। প্রমোশন হয় না এক রুলস মেনে। মা রকমারী হুইসল গলায় ঝুলিয়ে রাখতো। নানা ধরনের ও সাইজের হুইসল। রানার্সরা স্টার্টিং পয়েন্ট দাঁড়িয়ে। রেডি সেডি গো – বলে মা হুইসল বাজাবে। দৌড় শুরু।

মায়ের জীবন দৌড় শুরু হয়েছে অনেক কাল আগেই। দাদু চাকরিতে অবসর নেবার পর সিদ্ধান্ত নেন ছোট মেয়ের কাছেই থাকবেন। ছেলেরা চাকরি নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ছোটো মেয়ে শিক্ষকতার কাজে নিজেকে অর্পণ করেছে। আমার বাবার পরিচয় কেউ দাদুকে জানিয়েছেন। সেইসময় মায়ের বিয়ে করার চিন্তা ছিল না মাথায়। সে ছাত্রীদের নিয়ে ভালো দিন কাটাচ্ছে। আমার বাবা, মায়ের মতো কনভেনশনাল পেশায় যুক্ত ছিলেন না। উনি আর্ট স্কুলের গ্রাজুয়েট।

ঠাকুর্দা বেশ দূরদর্শী ছিলেন যে বাবাকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার-এর পথ ছাড়াও অন্য পথে জীবনকে চিনতে দিয়েছিলেন। আমি কৃতজ্ঞ এই গুরুজনদের কাছে। মা-বাবার বিয়ে দাদুর উপস্থিতিতে হয়। বাবা চাকরি সূত্রে ধানবাদে আসতেন তখন। এমনিতে বাবার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আমার জন্মের আগে থেকেই মায়ের মাতৃত্ব এর স্বাদ পাওয়া শুরু হয়েছে। ছাত্রীরা তো ছিল সবটা জুড়ে। তাছাড়া বড়ো মাসির বড়ো মেয়ে মামাবাড়িতে আমার মায়ের কাছে মানুষ। আজকে অনেকের ভাবতে অবাক লাগতে পারে যে – কলকাতার নাগের বাজারে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও কেন বড় মাসি ও মেসো মেয়েকে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পাঠিয়েছে ছোটো বয়সে। বড় মামার বড় মেয়েকেও মা এই ভাবে মেয়ের মতো মানুষ করেছে মামী অকালে চলে যাবার পরে। আমি তাই একা বড় হয়নি কোনোদিন। ভাই আসার পরেও কোনোদিন আমরা বুঝতে পারিনি মেয়ে বা ছেলের তফাৎ বাড়িতে। মা রান্না না করলেও নজর রাখতেন যেন ভালো তরকারি যেমন মাছ বা মাংস হলে সকলে সমান সমান ভাগ পায়। এমন কি যারা আমাদের দেখাশোনা করতো সেই দাদা/দিদিরা ঠিক করে ভাত মাছ খেতে পায়। মা এর উদ্যোগে দাদা ক্লাস ৮ অবধি পড়া শোনা করেছে যে আমাকে ও ভাইকে দেখাশোনা করত যখন মা স্কুল থাকতো। সেই দাদা এখন মধ্যবয়সী। মায়ের শেষ সময়ে সেই দাদা প্রতিদিন নিয়ম করে এসে মায়ের খাবার দেখা শোনা করে যেতো তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। আমার অবর্তমানে মাকে যত্ন করা – কথা না শুনলে জোর করে খেতে সাহায্য করা। ফিরে আসে ঠিক সেই মানুষ গুলোর সাহায্য যাদের মা চারা গাছ হিসেবে পেয়েছিল কোনো একদিন। মায়ের স্কুলের কিছু সহ যোদ্ধারা জীবনের প্রতি কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন ও হাত বাড়িয়েছেন যখন মা কাছের মানুষদের হারিয়েছেন এক এক করে। বাবা চলে যান অকালে তখন আমার হাই সেকেন্ডারি আর ভাই এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাকে দেখেছিলাম কি রকম শক্ত হয়ে সামলাচ্ছে আমাদের। তারপরে আমার আমেরিকা চলে আসা। ইচ্ছে করলে দেখা করা যেত না। ভিডিও কল হতো না এত সহজে আজ থেকে পনের – কুড়ি বছর আগে। ফোন লাইন বেশ ঝামেলা করত। তারপরে এলো সব থেকে কঠিন পরীক্ষা মায়ের জীবনে। নিজের ছেলে চোখের সামনে চলে গেল না ফেরার দেশে। মাকে তখন দেখেছি কি ভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। আমি এখানে বসে ছটফট করছি কিন্তু লকডাউন বলে বাড়ি যেতে পারছি না। মায়ের পাশে দাঁড়াবো যে একটু। কয়েক মাস পরে মায়ের কাছে যাবার সুযোগ এলো। জানতাম না সেটাই হবে আমাদের একসাথে শেষ কাটানো মুহূর্ত এই পৃথিবীতে। মা কেমন যেন বাচ্চাদের মতো ব্যবহার করলো। আমার হাতে একটু একটু করে খাবার খেলো। যেন আমি মায়ের রোলে। জানি ও মানি মা তো আছেন সকল ছেলে-মেয়ের প্রতিটি কোষে কোষে। প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে।

শ্রীমতি রেখা বসুর সরল সাদাসিধে কিন্তু সংগ্রামী ও জীবনবোধে সম্পৃক্ত দৃঢ়চেতা মন, কঠিন একাগ্রতা, জীবন সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখবে চিরকাল। তিনি রেখাদি নামে সুপরিচিত ওই অঞ্চলে। ৪০ বছর ধরে অনেক ছাত্রীদের জীবনের সঙ্গী। তিনি লাখ লাখ ছাত্রীদের ইউনিভার্সাল রেখা দিদিমনি ও প্রিয় রেখাদিদি তাদের বাবা-মায়ের।

পারিজাত ব্যানার্জী

রাধিকা স্তোত্র পাঠ

আমার নাম রাধিকা। বয়স বাইশ, সুশ্রী। পুরুষেরা ঠিক যেরকম নারী শরীর দেখলে বলে "ভরা যৌবনা", আমার ঠিক তাই। আমি লম্বাও, তবে এতটা নই যে কোনও যোগ্য পুরুষের আমাকে দেখতে মাথা উঁচু করতে হয়। তাতে যে পড়ে এসেছি আমরা সব মেয়েরাই, তাই জানিও; তাদের পৌরুষে আঘাত লাগে বড্ড সবসময়।

এতক্ষণ আমার কথা শুনেই বুঝেছেন নিশ্চয়ই, পুরুষদের আমি যথাযথই সম্মান দিয়ে থাকি। তাদের পছন্দ অপছন্দকে মর্যাদাও দিই। ঠিক যেমন এককালে মেয়েরা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ধরে নিয়ে পুজো করত, তেমনই আমি পুরুষদের মান্যতা দিয়ে থাকি মন থেকেই। পারলে পুজোই করতাম হয়তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়ের কোনও মেয়েকে তো আমি আর দেখিনি। তাই কেমন করে কি কি উপচার মেনে পুজো করতে হয়, তা ঠিক জানিনা। আর ভুল নিয়ম মেনে কিছু করার পক্ষপাতী নই আমি কিছুতেই। তাতে যদি আমার আরাধ্যের অমঙ্গল ঘটে! সেই পাপ করে কি করে কাটাবো আমি আমার সারাটা জীবন আমার একলার আলয়ে !

আজকের এই সময়টা বা তা থেকে প্রাপ্ত আমাদের এই বোধ আর চেতনা খুব সহজে আসেনি কিন্তু এখনকার মেয়েদের জীবনে। তার পিছনে রয়েছে সুবিশাল এক অতীত যার পুরোটা এখানে শোনাতে গেলে আমাকে হয়তো লিখে ফেলতে হবে কোনও মহাকাব্য। তবে ছোট করে সে কথা যদি এখানে নথিভুক্ত না করি আবার, তবে ইতিহাস কেমন করে মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে, তা বোঝানোও বড় কঠিন।

শোনা যায়, একটা সময় ছিল, যখন মেয়েরা তাদের সব দায়িত্ব যথানিয়মেই পালন করত – পুরুষের ও তার পরিবারের দেখাশোনা, সংসার সামলানো, পরবর্তী প্রজন্মকে জন্মদান, তাদের বেড়ে ওঠার পথের সহযাত্রী হওয়া – ইত্যাদি ছিল তাদের কাজ। তারপর, দেশের হাওয়া পাল্টাতেই হঠাৎ একদিন তারা পুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। বলল, তারাও কোনও ব্যাপারে কম নয় পুরুষদের থেকে কোনও বিষয়ে – সেকথা নাকি প্রমাণ করে দেবে। তারা নিজেদের সত্যিকারের সব ঘর সামলানোর দায়িত্ব ভুলে গিয়ে সকল বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিল খোলা আকাশের তলায়। সব কিছু নিয়ে পড়াশোনা করে বিজ্ঞ হয়ে উঠল, নিজেদের পায়ে দাঁড়ালো, এমনকি পুরুষদের সমানে সমানে দাঁড়িয়ে জীবনের লড়াইও করতে শুরু করল একেবারে প্রথম সারির সৈনিকদের মতোই। বলা বাহুল্য, এসব করতে গিয়ে তাদের সংসারে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হল। যে প্রকৃত কাজের জন্য তাদের জন্ম – পুরুষদের সেবা এবং সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন – তাতেই ফাঁকি দিতে শুরু করল তারা। প্রকৃতির নিয়মের বিপরীতে যাওয়ার ফলেই পুরুষদের তারা ক্রমাগত চক্ষুশূলও হয়ে উঠতে লাগল যথা নিয়মেই। তার ফলে যা হওয়ার তাই হল। পুরুষেরা নিজেদের শক্তির জোরে এই সমস্ত বিদ্রোহী নারীদের দমন করল। ভয়ানক সেই কয়েক শতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধতে খুব নির্মমভাবে নির্যাতিতা হয়ে অবশেষে হার মানল মেয়েদের দল। তারা এখন বোঝে, তারা নারী, মহিলা, মেয়ে। তাদের জীবনধারণ, কাজকর্ম সবকিছুই নির্ভর করে পুরুষদের উপর – মেয়েদের নিয়তির দেবতা যে তারাই। নিজেদের ভালো মন্দের কথা বিচার করার স্বাধীনতা আসলে জন্ম দেয় অশান্তির – তাই সেই চিন্তাও মূর্খামি। সে কাজের দায়িত্ব নিতে পুরুষেরা তো বরাবরই উৎসাহীও – তাই না! তাই পুরুষদের পাশে নয়; মেয়েদের স্থান তাদের পিছনে, সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে, আজ্ঞার চিরন্তন অপেক্ষায়। সারাদিনের ক্লান্তি, ঝড় জলের তোপ যখন পুরুষকে বিধ্বস্ত করে দেয়, তখন তারা ঘরে ফেরে – আর তাই সেই ঘরেই যেন বাঁধা পড়ে থাকে তখন আমাদের মতো কোনো মেয়ে – এটুকুই তো সামান্য চাহিদা পুরুষের। মেয়েরাই যে তাদের জীবনের এক টুকরো সুখ; এক পশলা বৃষ্টির সাথে ভেসে আসা নির্মল দখিনা বাতাস! তাই যদি আমরা তাদের ভালো মন্দের খেয়াল না রাখতে পারি তবে আমাদের প্রয়োজনই বা কি এই সমাজের!

সব পুরানো নিয়মকানুনের ঘরে তালা পড়লেও পড়াশোনাটা কিন্তু আমরা মেয়েরা এখনও শিখি। পুরুষেরা সত্যিই ভীষণ ভাবে প্রগতিশীল এ ব্যাপারে। ভেবে দেখলে, ঠিকই তো – নিজেরা লেখাপড়া না জানলে সন্তানদের সামলাবো কেমন করে? ঘরের সব ব্যাপারে পুরুষদের জড়ালেও তো মুশকিল। তবে নারীদের কোনও লেখা বা তাদের স্বাধীনতা যারা চায় এমন পুরুষদের লেখাও আমাদের পাঠ্যবইতে থাকে না। সেই সব লেখাই তো আমাদের দুপক্ষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল এক সময় আসলে। তাই খুবই কড়াকড়ি এ বিষয়ে। আর পাঠ্য বইয়ের বাইরে মেয়েদের কিছু পড়াশোনার উপরেও রয়েছে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা। কোনও কোনও বাউন্ডুলে মেয়ে এখনও অবশ্য সেইসব নিষিদ্ধ বই খুঁজে বার করে পড়ার চেষ্টা করে। যাই মানা থাকে, তার প্রতি যে কিসের লোভ মানুষের – তা অবশ্য আমি খুব একটা বুঝিনা। আমার এক বান্ধবী ছিল; শকুন্তলা। খুবই মেধাবী, ক্লাসে বরাবর প্রথম হত। দেখতে শুনতেও ভালো। পুরুষদের অনেক আশা ছিল ওর উপর। কিন্তু অত সুখ সহ্য হবে কেন মেয়ের? একদিন হঠাৎ জানাজানি হয়ে গেল আশ্রমে – সে লুকিয়ে পুরুষ বন্ধুদের সাহায্যে বাইরের জগতের বই এনে পড়ে, ব্যস – তার জীবনের ওখানেই ইতি। নানা, মারা যায়নি সে, পতিতা হয়েছে – ওরকম বার্মুখো মেয়েদের যে ওটাই নিয়তি!

আমার অবশ্য অতসব বিষয়ে জানার উৎসাহ নেই – ছিলও না কোনোদিন। পাঠ্য বই ছাড়া আর কিছু পড়লেই কেমন যেন অসুস্থ লাগত। আর পুরুষদের লেখা সেই সমস্ত শিক্ষামূলক বই ও গল্পের মধ্যেই বারবার দেখেছি ফুটে উঠেছে একটাই সতর্কীকরণ – তাদের আদরের হয়ে থাকতে বাধা নেই, কিন্তু স্বয়ং পুরুষ হতে আমরা যেন কখনো না চাই। তাহলেই ঘোর বিপত্তি। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি নিজেও মনে প্রাণে এই কথাই বিশ্বাস করি। বাবাও আমাকে বরাবরই তাই শিখিয়েছেন। ছোটবেলায় মাকেও দেখেছি কি সুন্দর মাথা নত করে বাড়ির সমস্ত কাজ সামলাতেন তিনি অবিরত। কখনো টু শব্দটিও করেননি। বাবাকেও তাই কখনো গলার আওয়াজ সপ্তমে তুলতে হয়নি তাঁর জন্য। বলতে গেলে বাবার একরকম স্নেহভাজনই ছিলেন তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। বছর বছর সন্তান উৎপাদন করে চলেছিলেন তিনি তাঁর প্রকৃত ধর্ম মেনেই। আমি ছিলাম তাঁর পঞ্চম সন্তান। আমার পর আরও তিন বোন। এমনকি মারা যাওয়ার সময়েও নতুন জীবন দানে ছিলেন তিনি ব্রতী – যদিও সেবার মা ছেলে কেউই বাঁচেনি। এরপর পুত্রশোকে বাবা পাথর হয়ে যান। স্বাভাবিক। আট মেয়ের দায়িত্ব পালন করাই যায় যদি নিজের ঘরের বাতি উজ্জ্বল হয় – সে কথা কে না জানে! পরের মাসে নতুন মা এসে তাঁকে না সামলালে আমাদের সংসারটার কি যে হত ভাবলেই ভয়ে শিরশির করে ওঠে এখনও আমার গা হাত পা। বলতে গেলে নতুন মাও তাঁর দায়িত্ব সামলেছেন বেশ পটু হাতেই। তাঁকে দেখেই তো আমার বেড়ে ওঠা। মায়ের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে তিনি জন্ম দিয়েছেন তিন ছেলেরও। আমাদের তাই চিন্তা নেই আর। বংশের প্রদীপ জ্বালার সলতে এসে গেছে সময় থাকতেই।

এবার তাই আমিও কিন্তু বেশ প্রস্তুত মায়েদের মতোই নিজের নারী জীবনের প্রকৃত ধর্ম পালন করার জন্য অন্যের ঘরে গিয়ে তার বংশ বৃদ্ধি করানোর প্রচেষ্টায়। কুড়ি থেকে চব্বিশ আমাদের মেয়েদের প্রজননের জন্য একদম ঠিকঠাক সময়। এবছরের "নারী মেলা"য় যোগ দেওয়ার আমি তাই অনুমতিও পেয়ে গেছি বাবার কাছে। "নারী মেলা" এখনকার পুরুষদের এক অভিনব আবিষ্কার। আগেকার দিনে হয় পরিবার পছন্দ করে বিবাহ সম্পন্ন করাতো নয়তো ছেলে মেয়েরা নিজেরাই একে অপরকে পছন্দ করে নিত। এই দুটি ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল একটাই – কে বন্ধ্যা কে সক্ষম, সে নিয়ে তেমন ভাবার সুযোগ সুবিধে থাকত না। তার উপর এক সময় এসে জড়ো হল মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতা – সে কথা তো আগেই বললাম। তাদের অনেকে সন্তান গ্রহণ করে তাদের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলী দিতে চাইতো না। আবার অন্য কেউ এতো দেরীতে সব প্রক্রিয়া শুরু করত যে সন্তান জন্ম দেওয়ার তাদের সাধ থাকলেও তা পূরণ হতো না অনেক খরচাপাতি করেও। তাই সন্তান উৎপাদনের হার কমে গিয়েছিল বিপুল আকারে। "নারী মেলা" শুরু হওয়ার পর থেকে এই সমস্ত ঝামেলার অবসান আপাতত ঘটেছে। সকল সন্তান প্রসবে সক্ষম পুরুষেরাই এই মেলায় আসেন তাঁদের সঙ্গিনীর খোঁজে। বাবা বা বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের অনুমতি নিয়ে সব যুবতীরাও যায়। তারপর সবার শারীরিক ও মানসিক গড়ন বিচার করে তাদের সেখানেই সন্ধীস্থাপন করানো হয়। তারপর হয় বিয়ে। আমিও এ বিষয়ে অনেক ভেবে

দেখেছি – এটিই সঠিক পন্থা। বিয়ে মানে তো চুক্তি – তার সাথে মনের মিল, ভালোবাসার মতো কেজো কথাবার্তার কোনও সম্বন্ধ আদৌ আছে কি ? তাহলে কেন যে এসব অযৌক্তিক জিনিসপত্র নিয়ে আগেকার দিনের লোকেরা এত মাতামাতি করতো, ঈশ্বরই জানেন, আর জানে পুরুষ। তাই, সব দিক দিয়ে রাজযোটক হলেও তাদের যদি কোনও মেয়ে মনে না ধরে ঘর করার পরেও, তবে তাদের অধিকার রয়েছে বৈকি বহু নারীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার। নারীদের এ ক্ষেত্রে অবশ্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ; তাদের যে বিয়ে হয়; তারা করে না। চুক্তি হয় তাদের বাবা এবং স্বামীদের মধ্যে – সেখানে তাদের কিছুর বলার মানেও হয় না। তাই তাদের পুরুষ পছন্দ না হলেও মানিয়ে নিতে হয় – এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম প্রজননে সক্ষম কোনও বিধবা।

তবে এসব নিয়ে আমি তেমন চিন্তিত নই। কারণ আমি জানি, আমি রাধিকা – একজন বাইশ বছরের সুশ্রী, প্রজননের ক্ষমতাধারী সঠিক পণ্য এই "নারী মেলা" র বাজারে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমি নিজেকে আমার পুরুষের জন্য বদলাতে পারি, মাথা নিচু করে চলতে পারি, নিজে সন্তান না চাইলেও তা গ্রহণ করতে পারি পুরুষের বংশের স্বার্থে আর স্বাধীনতার পাখা যদি গজায় কখনো ভুল করেও সূর্যাস্তের আলোর দিকে তাকিয়ে – তবে তা নির্দ্বিধায় ছেঁটে ফেলতেও আমার হাত কাঁপবে না। আসলে নারীবাদের প্রকোপে পড়া সোজা হয়ে যাওয়া শিরদাঁড়া নামক কোনও শরীরী খুঁত এই প্রজন্মের মেয়েদের যে অন্তরেও আর বাঁচে না পরের নিয়মেই; নিজেরই অবহেলায় !

উদয় মুখার্জী

আজকের দুর্গা

অনেকদিন আগের কথা – তা তো প্রায় চল্লিশ বছর তো নিশ্চয়ই – আমার বন্ধু মানবের মামাবাড়িতে গিয়েছিলাম শিবলী গ্রামে। মানব আমার স্কুলের বন্ধু – অনেকদিন পরে দেখা। তাই প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল দলমা পাহাড়ের নিচে ওর মামা বাড়িতে – নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ – মাত্র তিনশো পরিবারের বাস। গ্রামের ঠিক পিছনে শুরু জঙ্গল আর তারপরে বেশ উঁচু পাহাড়ের সারি – শান্তিতে কাটবে কদিন। আজ বন্ধু গেছে জামশেদপুরে তার পরিবার নিয়ে – আমি তো এখনো কোনো ঘাটে নৌকা বাঁধিনি – তাই আমি রয়ে গেলাম গ্রামেই – একটু নিজের সাথে সময় কাটানোর ইচ্ছে নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম গ্রামের এক প্রান্তে খরকাই নদীর ধারে – বেশ আয়েশ করে বসলাম একটি আম গাছের নীচে। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে – শান্ত চারিদিক – কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে নদী আপন মনে। দূরে কাশ ফুলের ঝাড়গুলো দুলছে মৃদু মন্দ হাওয়াতে। এত নিস্তব্ধতা আমাকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিলো – অন্যমনস্ক আমি অপলক দৃষ্টিতে দেখছিলাম দূর বনে নদীর হারিয়ে যাওয়া। প্রকৃতির এই শান্ত পরিবেশের যাদুতে আমার মনটাও যেন ভেসে গেল লাগাম ছাড়া গতিতে কোন অজানা পথে। ঘন নীল আকাশে প্যাঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘেরা যেন ঘুরে ফিরে মাতোয়ারা আনন্দে,শান্তির আবাহনীতে। শারদোৎসবের দিনে মায়ের আবাহন আসন্ন প্রায়। দূরে শোনা যায় ঢাকের চেনা আওয়াজ আর সাথে মাদল – ধামসার গুরু গম্ভীর শব্দ। মা! মা দুর্গার দশ হাতে অস্ত্র – শত্রু নিধনে, সৃষ্টিকে বাঁচাতে। সংগ্রামী নারীর মূর্ত প্রতীক। আরো অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকি একসাথে দশ টি অস্ত্র ও তার ব্যবহার যেন সেই যুগের multitasking. সেই অদম্য শক্তি আর আপোষহীন প্রতিবাদী মনোভাবে গর্জে ওঠা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনে করিয়ে দিল ইদানিং কালের কত মহীয়সী নারীর কথা। এই গ্রামেই এসে দেখা পেলাম এইরকম এক প্রণম্য নারীর – মানবের মামীমা। গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা – ছাত্র ছাত্রীরা যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনই ভালোবাসে। সন্ধ্যা বেলায় পড়াতে বসেন গরীব ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের। প্রত্যেক রবিবারে গ্রামবাসিন্দারা আসে তাদের নানা সমস্যা, অভাব – অভিযোগ নিয়ে – তাঁর সালিশি চাই যে। মামীর রান্নার তো জবাব নেই। বিয়ের আট বছরের মধ্যেই স্বামীকে হারান তিনি – দুই ছেলে মেয়েকে অতি কষ্টে মানুষ করেন – কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে – সাথে চলে তার উচ্চ শিক্ষার অধ্যবসায়। সেলাই, উল বোনা ও ছাত্রদের পড়িয়ে কঠিন পরিশ্রমে গড়ে তোলেন এক সুখের সংসার – ছেলে মেয়েরা বেশ ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত – সম্প্রতি তিনি এই পাকা বাড়িটি করেছেন। এই দুর্গা রূপিনী আমাদের মামীমা তো সেই বিভিন্ন ভাবে multitasking করে আজ আমাদের কাছে এক সংগ্রামী মহিলার মূর্ত প্রতীক – তাঁকে ও তাঁর মত কঠিন সংগ্রামের মধ্যে উঠে আসা, অন্যায়ের বিরূদ্ধে গর্জে ওঠা আজকের দুর্গাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

অনিতা মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখা ও আবৃত্তি আর গানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। বেথুন কলেজের স্নাতক অনিতা ''সৌরভ সঙ্গীতায়ন'' থেকে ''সঙ্গীত ক্রিয়া বিশারদ'' উপাধিতে সম্মানিতা হন। সঙ্গে চলতে থাকে কবিতা ও গল্প লেখা। বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''বিরহী'' প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। গল্প সংকলন ''দুরন্ত জীবন'' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে, ''ঐশ্বর্য'' তাঁর নবতম কাব্য সংকলন যা স্বীয় দ্যুতিতেই কাব্য রসিকের নজর কাড়বে।

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী – অধুনা উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি নিবাসী। বাচিক শিল্পী, আবৃত্তিকার ও সঞ্চালিকা। যাপন কবিতা ও কলম। দীর্ঘ ১৪ বছর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি অনুরাগ সাহিত্য। কলকাতা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পর এই প্রথম বাতায়নের সাথে সংযুক্ত হওয়া।

দেবীপ্রিয়া রায় — লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

ইন্দিরা চন্দ — মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায় – বেড়ে ওঠা কলকাতায়, বসবাস বস্টনে। লেখালেখি শুরু ২০১৬ তে। ছোট গল্প এবং আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে বাংলা লাইভ, পরবাস, কল্পবিশ্ব ওয়েব ম্যাগাজিনে, আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, রোববারে। ২০২০র বইমেলায় প্রকাশিত প্রথম বই-ছোট গল্প সংকলন-ক্যালাইডোস্কোপ, দে'জ পাবলিকেশন থেকে।

মহুয়া সেনগুপ্ত – জন্ম উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে। বড় হয়ে ওঠা হুগলি শহরে। শিক্ষা অক্সিলিয়াম কনভেন্ট, ব্যান্ডেল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শারীরবিদ্যায় স্নাতক। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি। পেশা অধ্যাপনা ও গবেষণা। বর্তমানে, ভারতের আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরে বায়োটেকনোলজি বিভাগে কর্মরত। ছ'টি কাব্যগ্রন্থ, এ আমার ছায়াজন্ম (পরম্পরা প্রকাশন, ২০০৯), চিরহরিৎ গাথা (সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৮), তারামাছ নাকছাবি (বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ২০২০), বৃষ্টিদ্বীপের কবিতা (পরম্পরা প্রকাশন, ২০২১), প্রেমের কবিতা (সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০২১) ও উনিশ বসন্তের নির্জনতা (কমলিনী প্রকাশন, ২০২২) এখনও অবধি প্রকাশিত। সখ, বই পড়া, গান শোনা, রান্না করা।

মানস ঘোষ — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার দুটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

মনীষা বসু — জন্ম কলকাতায়। সত্তর দশকে বিয়ের পর থেকে শিকাগোবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। Purdue University থেকে কম্পিউটার সাইন্সে বি এস ডিগ্রি। পেশায় আই. টি.। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় অবসর — বই পড়া, গান শোনা, লেখা আর বাগান করা।

ময়ূরী মিত্র – বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষক, সাহিত্যিক, নাট্যশিল্পী। পড়াশুনো : কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাসে মাস্টার্স এবং বিশেষ শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য বি এড। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড, পবিত্র সরকারের কাছে গবেষণা। বিষয় : উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক উত্তরণ ও নাটকে রাজনীতি চর্চা। সম্প্রতি একুশ শতক প্রকাশনা সংস্থা এ বিষয়ে লেখকের গ্রন্থপ্রকাশ করেছেন। বইয়ের নাম – মহাবিদ্রোহের পরে নাটকের চোখে। ময়ূরী মানুষকে দেখেন এবং মানুষে মানুষ খুঁজে বেড়ান আর খুঁজে পেলে খুশী হন। সে মানুষেরাই উঠে আসে তার লেখায়।

নূপুর রায়চৌধুরী – জন্ম, পড়াশুনো কলকাতায়। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবনে শিক্ষকতা করেছেন। আমেরিকায় বায়োমেডিক্যাল সাইন্স-এ গবেষণায় যুক্ত। লেখালিখির নেশা। বর্তমানে মিশিগানের বাসিন্দা।

Palashree Roy, based in Sydney, is a passionate singer. She mostly sings songs of Tagore. Apart from being a singer she also loves to scribble down her thoughts sometimes and give form to her imaginations. She is also very interested in anything aesthetic and is very passionate in designing interiors. Palashree looks forward to someday spreading the essence of Tagore's thoughts and ideas across all global platforms through various projects.

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার গোষ্ঠী সম্পাদিকা। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

রুদ্রশংকরের লেখালেখির শুরু নব্বইয়ের দশকে। ভারত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় ও কবিতা সংকলনে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ। পেয়েছেন ভাসানগর পুরস্কার কবিতা আশ্রম প্রদত্ত কবি বিকাশ কুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার, বই-পার্বণ সম্মাননা ইত্যাদি। তাঁর কবিতা থেকে তৈরি হয়েছে একাধিক গান। গানের জন্য ২০২০ সালে পেয়েছেন মির্চি মিউজিক অ্যাওয়ার্ড।

শহিদুল ইসলাম – সাবেক অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন বিভাগ, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ, শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তি ২০১৩।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney. I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

সৌমিক বসু – পেশাগত ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, নেশাগত ভাবে পাঠক। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন অতিবাহিত করলেও, ফিরে ফিরে গিয়েছেন কলকাতায়, বাংলা ভাষার টানে। ২০১৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বাসিন্দা। পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে অবসর সময় অনেকটা কাটে সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্য চর্চায়। লেখক হিসাবে বিচরণ মূলত প্রবন্ধ ও রম্যরচনায়।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

আমি **শম্পা দে**। কোলকাতায় থাকি। শিক্ষাগত যোগ্যতা এম এ, বি এড। পেশায় একজন শিক্ষিকা। বয়স ৬১ বছর। শ্রুতি নাটক ও আবৃত্তি করতে ভালোবাসি। এখনও নিয়মিত মঞ্চে নাটক ও কবিতা পরিবেশন করে থাকি। ছোটবেলা থেকে লিখতে ভালোবাসি। সাংসারিক জীবনে আমি দুই সন্তানের মা। সংসারের অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে চলার পথে এই লেখার মাধ্যমেই আমি আনন্দ খুঁজে পাই।

সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় – অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বসবাস । দুই ছেলে, স্বামী, NRIর সংসার, full time কাজ, ফাঁক ফোকরে লেখা লেখি, লিখবো বলে অনেক কথা খুঁজি / লিখছি যা তার সব মানে কি বুঝি !

সুপ্রতীক মুখার্জী। পার্থিব বাসিন্দা। প্রজ্ঞা-পিয়াসি।

তনিমা পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্‌ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের ।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

তাপস কুমার রায় – যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অর্থনীতির গবেষক তাপস কুমার রায় প্রাথমিকভাবে একজন চিত্রশিল্পী। কনেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথরিন মায়ারের কাছ থেকে ফাইন আর্টস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাপসের লেখায় ধরা পড়ে প্রবাস-এর একাকীত্ব এবং বাজারি সভ্যতায় তার বিপণ্নতা। তার লেখা পূর্বে দেশ বা দুকুল-এর মত আন্তর্জাতিক বাংলা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং এছাড়াও বাঙালি চলচ্চিত্র গান হয়েছে। 'ঘর খোঁজা সন্ধ্যারা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ।

অলক ভট্টাচার্য্য – শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর নিয়মিত সদস্য। দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চায় রত। মূলত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন।

অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য – শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর নিয়মিত সদস্য। দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চায় রত। মূলত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন।

খনা দেব – শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর নিয়মিত সদস্য। দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চায় রত। প্রহসন জাতীয় রচনা ও ব্যাঙ্গাত্মক লেখায় খনা দেবের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

Jay Banerjee is a vibrant and emerging young talent of visual and literary arts, based in Ann Arbor, Michigan, US. With a natural inclination towards the expressive, they have found a voice through the malleable mediums of clay and ceramics, as well as the nuanced strokes of pencil sketching. Jay was encouraged to explore artistic pursuits from a young age. Jay's journey into the arts began in the classroom, but it quickly transcended those walls as they sought to learn through experience, observation, and experimentation. Jay is formally trained in clay and ceramics possesses an innate ability to capture emotion and narrative through their work. The shading and line work in pencil sketching allow for a precision and detail that contrasts beautifully with the organic nature of their ceramic creations. Parallel to their visual artistry, Jay has the power of words to express themselves through poetry. They write with a sensitivity and depth that resonate with audiences and reflect their observations of life.

"নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।

যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"

– রবীন্দ্রনাথের লেখা "চিত্রাঙ্গদা" থেকে নেওয়া

9 780645 572681